হক্কানী উলামায়ে কিরাম অনুমোদিত, দ্বীনি মাদরাসাসমূহের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত এবং কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সেন্টার পরীক্ষার কিতাব হিসেবে নির্ধারিত।

সহজ
আকীদাতুত্ ত্বাহাবী

আকীদাতুত্ ত্বাহাবী এর সহজ তরজমা
ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা
কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব রহ.-এর রচিত আরবী হাশিয়া ও
মুফতী ইউসুফ সাহেব এর দরসে আকীদাতুত্ ত্বাহাবী
অবলম্বনে মুফতী মুজীবুর হক কর্তৃক সংকলিত,
মাওলানা হাবীবুর রহমান, শাইখুল হাদীস,
মাদরাসা দারুর রাশাদ কর্তৃক সম্পাদিত।

আল কাউসার প্রকাশণী

ইসলামী টাওয়ার ॥ পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১,বাংলাবাজার ॥ ৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন : ৭১৬৫৪৭৭

অবতারণা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

এ কথা নিশ্চিত যে সহীহ ঈমান আকীদা ই হল, পরকালের একমাত্র নাজাতের উসিলা। তাই সমস্ত মুসলমানের জন্য সহীহ ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তদানুযায়ী মওত পর্যন্ত দৃঢ় থাকা এবং সহীহ ঈমান আকীদাকে পরকালের একমাত্র পাথেয় হিসেবে বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর সহীহ ঈমান আকীদার মূল উৎস হল, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণের মত ও পথের উপর অটল ও অনড় ব্যক্তিদেরই নাম করণ করা হয়েছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

ইলমুল আকাঈদ বা সহীহ ঈমান আকীদা সম্পর্কে সর্বপ্রথম "আল-ফিকহুল আকবর" নামে একটি বিরল কিতাব লিখেন ইমামে আযম হযরত আবূ হানীফা রহ.। পরবর্তীতে অনেকেই এ সম্পর্কে অনেক কিতাবাদি লিখেছেন, আজ থেকে এগারশত বৎসর পূর্বে ইমাম তাহাবী রহ. রচিত আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল্ জামাআতের বিস্তারিত আকীদা সম্পর্কে লিখিত 'আকীদাতুত্ তাবাবী" নামক গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের উলামা মাশায়েখদের কাছে সর্বাধিক মাকবুল ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে কিরাম কিতাবটিকে মাদরাসার নেসাবভুক্ত করেছেন এবং দারুল উলূম দেওবন্দ এর সাবেক মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব রহ. গুরুত্বপূর্ণ টীকা লিখেন আরবী ভাষায় এবং দারুল উলুমদেওবন্দের উস্তাদ মুফতী ইউসুফ সাহেব কিতাবটির শরাহ লিখেন উর্দু ভাষায়।

ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায়ও কিতাবটির দু-তিনটি অনুবাদ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বের হয়েছে তবে কোনো কোনো অনুবাদ খুবই সংক্ষিপ্ত আবার কোনো কোনোটি মূল কিতাবকে সামনে রেখে করা হয়েছে স্বতন্ত্র রচনা। তাই আমরা উপরোক্ত আরবী টীকা ও উর্দু শরাহসমূহকে সামনে রেখে কিতাবটির একটি সহজ ও সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি, আর এ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রদান করি

আমার স্নেহাস্পদ ভাই কাওরান বাজার মাদরাসার উস্তাদ ও বর্তমানে সৌদী আরবে চাকুরীরত মুফতী মুজীবুল হক চাটগামীকে।

আমাদের বিশ্বাস বাংলা ভাষায় মূল কিতাবটির এত সহজবোধ্য কোনো সংকলন এ যাবত প্রকাশিত হয়নি এবং ইলমে আকাঈদ তথা সহীহ ঈমান আকীদা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে কিতাবটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আর কিতাবটি সংকলনের ক্ষেত্রে যে সব ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে সেগুলো হল ঃ

- মূল কিতাবের সহজ ও সরল অনুবাদ।
- মূল ইবারত হল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।
- সহীহ আকীদা বা বিষয়ের জন্য মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধ্যায় ও শিরোনাম সংযোজন।
- আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল্ জামাআত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলসমূহের পরিচয় এবং ৭২টি ভ্রান্ত দলের বিস্তারিত বিবরণ।
- খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে একটি বিশেষ সমীক্ষা সংযোজন।
- কিতাবের শেষাংশে হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব রহ. রচিত খেলাফত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা সংযোজন।

পরিশেষে এ কাজে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কিতাবটির অনুবাদ ও বিশ্লেষণে কোনো ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হলে বা কিতাবটির মানোন্নয়নের ব্যাপারে কোনো সুপরামর্শ থাকলে তা আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সুধরিয়ে নিব ইনশাআল্লাহ।

আরজ গুজার

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা।

তাং ২৯/০৬/২০০১ ঈ.

সূচিপত্র

পঞ্চম পাঠ

ষষ্ঠ পাঠ

সপ্তম পাঠ

অষ্টম পাঠ

নবম পাঠ

দশম পাঠ

একাদশ পাঠ

দ্বাদশ পাঠ

ত্রয়োদশ পাঠ

চতুর্দশ পাঠ

পঞ্চদশ পাঠ

ষষ্ঠদশ পাঠ

আকীদাতুত্ ত্বাহাবী সমাপ্ত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম পাঠ
আকীদার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা,

আপনার সামনের কিতাবটির মূলনাম "বয়ানুস সুন্নাহ" তবে আকীদাতুত্ ত্বাহাবী নামে অধিক পরিচিত। অনেকে বলেছেন, এর পূর্ণ নাম হল, "বয়ানু আকায়িদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত আলা মাযাহেবে ফোকাহায়িল মিল্লাত" কিতাবটি আকীদা সম্পর্কীয়।

কিতাবের মূল উদ্দেশ্যে ফিরে যাওয়ার আগে, এখানে পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ (১) আকীদার পরিচয় (২) আলোচ্য বিষয় (৩) উদ্দেশ্য (৪) অবস্থান (৫) লেখক পরিচিতি।

(১) আকীদার পরিচয় ঃ আকীদা শব্দটি একবচন। এর বহুবচন আকায়িদ, অর্থ বিশ্বাস-ইয়াকীন আর পরিভাষায় ইলমুল আকায়িদ বলা হয় এমন একটি ইলমকে, যার মধ্যে ইসলামী আকীদা তথা আল্লাহ তা'আলার একাত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপরিউক্ত কথাটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, শরী'আতের কিছু বিধি-বিধান এমন আছে যেগুলোতে আমল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উক্ত বিধানগুলোকে আহকামে ফরয়িয়্যা তথা আনুষঙ্গিক বিধি মালা বলা হয়। আর কিছু বিধি-বিধান এমন আছে যেগুলোতে আমল উদ্দেশ্য হয় না। বরং সেগুলোকে অন্তরে বসানো এবং গেঁথে রাখা উদ্দেশ্য হয়। উক্ত বিধানগুলোকে আহকামে আসলিয়্যা তথা মৌলিক বিধি মালা ও আকায়িদ বলা হয়।

(২) আলোচ্য বিষয় ঃ আল্লাহ তা'আলার একাত্ববাদ, গুণাবলী এবং অন্যান্যা আকীদাসমূহ।

(৩) লক্ষ্য ঃ উভয় জাহানে সফলতা অর্জন করা, অথবা মৌলিক আহকামগুলোর ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

(৪) আকীদার অবস্থান ঃ সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি আত্মার শুদ্ধি এবং আকায়েদের শুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত যে কোনো বাহ্যিক কর্মকাণ্ড বৃথা। সুতরাং এ ধরনের পরিশুদ্ধি অর্জন করা ফরয।

জেনে রাখুন, ঈমান মূলত অন্তরে উৎপাদিত একটি গাছ। যার শাখাগুলো বাহ্যিক আমল আকারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রকাশ পায়। কোনো শাখা না থাকা গাছ না থাকার কারণ হয় না। তবে গাছের শিকড় উপড়ে গেলে গাছ শাকাসহ বিনষ্ট হয়ে যায়। তেমনি ঈমানী গাছের শিকড় যদি অন্তরে গেড়ে বসে তবে বান্দার কর্মকাণ্ড মাকবুল হয়। কিন্তু আমলের শূণ্যতা ঈমান না থাকার কারণ হয় না। তবে ঈমানের গাছই যদি না থাকে বা থাকলেও বেদআত ইত্যাদির উই পোকা তার শিকড়কে নষ্ট করে ফেলে এবং ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে সমস্ত আমল ভেস্তে যাবে। আমল কাউকে জোর করে মুমিন বানাতে পারবে না। উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও আকায়েদের অবস্থান বুঝতে পেরেছেন।

ইমাম ত্বাহাবী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ

নাম আহমদ, উপনাম আবূ জাফর, বাবার নাম মুহাম্মদ। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি ২২৯ হিজরী সনের ১০ই রবিউল আওয়াল রোজ রোববার রাতে 'তাহা' নামক মিশরের পাহাড় অঞ্চলীয় একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে তাকে ত্বাহাবী বলা হয়। তবে ঐতিহাসিকদের ভাষ্য মতে ইয়ামানের প্রসিদ্ধ গোত্র আযদের শাখা হিজর ছিল তাদের আদি ভূমি। এ জন্যই তাকে আল আযদী আল হিজরীও বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে যেহেতু তাঁর পিতা এবং পিতামহ মিশরে হিজরত করেন, তাই তাকে আল মিশরীও বলা হয়। তবে তিনি ইমাম ত্বাহাবী নামে বেশি পরিচিত।

জ্ঞানার্জন

ইমাম ত্বাহাবী রহ. প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে স্বীয় পিতার নিকট সমাপ্ত করেন। তার পিতা একজন প্রখ্যাত আলেম এবং ধর্মভীরু লোক ছিলেন। যে বছর ইমাম ত্বাহাবীর মামা ইসমাঈল মুযানী মারা যান সে বছর তার পিতাও ইন্তিকাল করেন।

ইমাম ত্বাহাবী রহ. স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শহরে চলে আসেন। সেখানে স্বীয় মামা ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী যিনি ইমাম শাফেঈ রহ.-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ ছিলেন তার নিকট অধ্যয়ন শুরু করেন। ইনি ছাড়া আরো অনেক বিখ্যাত আলেমগণের নিকটও তিনি জ্ঞানার্জন করেন।

ইলমী মর্যাদা

তিনি হাদীস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ প্রমুখ বিষয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন। মুল্লা আলী ক্বারী রহ. তাকে তৃতীয় স্তরের মুজতাহিদদের মধ্যে গণনা করেছেন।

তিনি কোন মাযহাবের?

ইমাম ত্বাহাবী রহ. জীবনের প্রাথমিম পর্যায়ে স্বীয় মামা ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযনীর নিকট ইলমে ফিকাহ অর্জন করেন। এজন্য প্রথমে তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে তিনি হানাফী মাযহাবের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর অনেক কারণ বর্ণনা করা হয়। তন্মধ্যে কিছু মন গড়া আর কিছু দুর্বল। আসল কারণ হল, তিনি তার উস্তাদ এবং মামা ইমাম মুযানীকে দেখতেন যে, কঠিন কঠিন মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করছেন। আর সে অনুযায়ী ফয়সালা দিচ্ছেন। এ অবস্থা দেখে ইমাম ত্বাহাবীর মাঝেও হানাফী কিতাবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় মামার সাথে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের প্রমাণাদী মজবুত হওয়ায় মামার দলীলগুলো মনপুত হত না। ফলে তিনি পরবর্তীতে কাযী আহমদ ইবনে আবী ইমরান থেকে নিয়মিত হানাফী ফিকাহ অর্জন করা শুরু করেন এবং হানাফী মাযহাবে দীক্ষিত হয়ে পড়েন।

রচনাবলী

ইমাম ত্বাহাবী রহ. কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে পঁচিশটির অধিক পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হল, (১) "মুখতাসারুর ত্বাহাবী" বা "শরহে মাআনিল আছার" (২) আকীদাতুত্ ত্বাহাবী। এ গ্রন্থে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাসমূহ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদের ফিকাহ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

ইন্তিকাল

অবশেষে ইমাম ত্বাহাবী রহ. ৯২ বছর বয়সে ৩২১ হিজরী সনের যিলকদ মাসে, রোজ বৃহস্পতিবার রাতে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং কেরাফা নামক জায়গায় চিরকালের জন্য আত্মগোপন করেন। ইন্নালিল্লাহ......।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْفَقِيْهُ عِلْمُ الْاَنَامِ حُجَّةُ الْاِسْلَامِ اَبُوجَعْفَرٍ اَلْوَرَّاقِ الطَّحَاوِيْ اَلْمَصْرِيْ رَحِمَهُ اللّٰهُ

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوْفِيْ وَاَبِيْ يُوْسُفَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِيْ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيْ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَيَدِيْنُوْنَ بِهِ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

শেখ ইমাম ফকীহ সৃষ্টির মহান ব্যক্তিত্ব হুজ্জাতুল ইসলাম আবু জাফর আল ওয়াররাক আত্ত্বাহাবী আল মিশরী বলেন ঃ

ইহা শরী'আত বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ যথা ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবেত কুফী রহ. ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আনসারী রহ., আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. প্রমুখ ইমামদের মতানুসারে এবং ধর্মের যে সব মূলনীতি তারা বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে যে সব মূলনীতি তারা মেনে চলতেন সে অনুসারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাসমূহের বর্ণনা।

ব্যাখ্যা ঃ রচনার এ অংশটি ইমাম ত্বাহাবী রহ.-এর নিজের লিখিত নয়। তার কোনো শাগরেদের লিখিত। কারণ ব্যক্তিত্ববান লোকেরা আত্ম প্রশংসা পছন্দ করেন না।

ওয়াররাক ঃ ইহা একটি ইঙ্গিত পূর্ণ শব্দ। সাধারণত এটি ইমাম ত্বাহাবী রহ. সম্পর্কে বলা হয় না, তবে ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই।

ত্বাহাবী ঃ মিশরের অদূরে পাহাড় অঞ্চলীয় একটি গ্রামের নাম আর সেটিই তার আসল জন্মভূমি। সে দিকেই ইঙ্গিত করে তাকে ত্বাহাবী বলা হয়। যেহেতু তিনি মিশরের অধিবাসী তাই তাকে মিশরীও বলা হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পরিভাষাটি বর্তমানে বিকৃতির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। বলতে গেলে কম-বেশী সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দাবীদার। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী দরকার তা তাদের মধ্যে নেই। এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক পরিচয় জানা না থাকার কারণে, কারা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত-কারা অন্তভুক্ত নয়? তা জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের উচিত হবে তাদের পরিচয় জানা এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা। নিম্নে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় তুলে ধরা হল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উৎস ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ পরিভাষাটির মূল উৎস হলো একটি হাদীস। হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তেহত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। একথা শোনে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল ঐ দলটি কারা? উত্তরে নবীজী বললেন, "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى"

যে রাস্তার উপর আমি এবং আমার সাহাবারা আছি।

এ উত্তরটির দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আসলে নবীজী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কথাই বলেছেন, তবে একথাটি বুঝার জন্য সামান্য বিশ্লেষনের প্রয়োজন আছে। এখানে দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত পূর্ণ দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। একটি হলো انا দ্বিতীয়টি হলো اصحابى - انا অর্থ আমি এ শব্দটি বলে তিনি আপন সত্তাকে বুঝিয়েছেন। আর أصحابى বলে স্বীয় সাহাবাদেরকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এবং সাহাবাগণ সত্য মিথ্যা পরখ করার মাপকাঠি। তবে এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা দ্বারা তাঁর সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ সুন্নাত বলা হয় এমন পন্থাকে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেছেন। চাই তা আকীদা সর্ম্পকীয় হোক বা কাজ বা কথা সর্ম্পকীয় হোক। এতে বুঝা গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার বিভিন্ন দিক হল

সুন্নাতের আলোচ্য বিষয়। আর এখানে সাহাবা দ্বারা সাহাবাদের পুরো জামাতই উদ্দেশ্য। সুতরাং এখন أصحاب এবং أنا এর অর্থ দাঁড়ালো সুন্নাত এবং জামাআত। এ অর্থটি হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক, কারণ ما أنا عليه وأصحابي এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, مَنْ كَانَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ অর্থাৎ যারা সুন্নাত এবং জামাআতের উপর থাকে। এতে বুঝা যায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই রেখেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় জানার জন্য সংক্ষেপে দুটি জিনিস জেনে রাখা দরকার। একটি হল সুন্নাত, অর্থ ঐ সকল কথা বা কাজ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন বা বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোরআন এবং হাদীছটি হল অপর জামাত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ উম্মতের পূর্ববর্তী নেককার লোক জন অর্থাৎ সাহাবা এবং তাবেঈন গণ, যারা কোরআন হাদীছের প্রামাণ্য সৎকথার উপর স্থির ছিলেন। আর কেউ বলেছেন, জামাত দ্বারা ঐ সকল আহকাম বা বিধি-বিধান উদ্দেশ্য– যেগুলোর ব্যাপারে সাহাবাগণ চার খলীফার যুগে একমত হয়েছিলেন। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এমন একটি দলের নাম যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন এবং তাদের ত্বরীকার উপর স্থির থাকেন, কোন ধরণের বেদআতে লিপ্ত হন না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপরোক্ত সজ্ঞায় রাসূল এবং সাহাবা উভয়ের ত্বরীকার উপর স্থির থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্বরীকা মানে সাহাবাদের ত্বরীকা না মানে, তবে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উল্লেখ্য, হুজুরের নিকট সাহাবাদের প্রশ্ন ছিল মুক্তিকামী দল সম্পর্কে। সুতরাং এর পরিষ্কার উত্তর أنا وأصحابي হওয়া ছিল। অর্থাৎ ঐ দলটি আমি এবং আমার সাহাবা। কিন্তু তিনি সরাসরি এ উত্তর না দিয়ে– ما أنا عليه وأصحابي বলে উত্তর দিয়েছেন। এর কারণ হলো, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য নবীজীর যুগের হক পন্থি কারা তা নির্দিষ্ট করা ছিল না বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফেৎনার যুগে হক পন্থি কারা হবে তা নির্দিষ্ট করা। সুতরাং তিনি যদি হক পন্থি হওয়ার জন্য শুধু কোরআন সুন্নাহের

অনুসরণকেই মাপকাঠি বানাতেন তাইলে এ উত্তরটি ঐ যুগটির যথোপযুক্ত হতনা, যে যুগে বাতিল দলটি পর্যন্ত কোরআন-সুন্নার অনুসারী হওয়ার দাবী করে। এজন্য তিনি এমন একটি পরীক্ষিত মূলনীতির কথা বলেছেন, যা প্রত্যেকটি যুগের জন্য উপযোগী হবে। ঐ মূলনীতিটি শুধু কোরআন হাদীছ নয়। বরং কোরআন হাদীছের ঐ বাস্তব চিত্র যা তিনি সাহাবাদের সামনে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন আর সাহাবায়ে কেরাম তা দেখে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এতে বুঝা যায় সাহাবাদের সামনে এক দিকে তাঁর অনুপম আদর্শ ছিল। অন্য দিকে তার বাস্তবচিত্র ছিল। এমতাবস্থায় প্রশ্নকারীর জন্য এর চেয়ে পরিষ্কার উত্তর আর কি হতে পারে' যারা তার কাছে সরল পথের খুঁজে আসতেন তাদেরকে তিনি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতেন এবং মুখে বলে দিতেন যে, সরল পথ এটিই। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তিকামী লোকদের নাম না নিয়ে তাদের ঐ সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা মুক্তি কামী দল নির্ণয়ে যুগে যুগে কাজে লাগবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্টাবলী

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি) থেকে বর্ণিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ওরাই যাদের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত দশটি বৈশিষ্ট্য থাকবে।

(১) শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) কে অন্য সাহাবীদের উপর প্রধান্য দেয়া।

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই জামাতাকে সম্মান করা।

(৩) দুই কেবলা অর্থাৎ কাবা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের কদর করা।

(৪) পরহেজগার এবং ফাসেক উভয় ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়া।

(৫) নেককার এবং ফাসেক উভয় ইমামের পেছনে নামাজ পড়া।

(৬) ন্যায় পরায়ণ এবং জালেম কোন বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা।

(৭) উভয় পায়ের মৌজার উপর মাসেহ করা।

(৮) তাকদীর তথা ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াকে বিশ্বাস করা।

(৯) নবীগণ এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী ছাড়া অন্য কারো জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষী না দেয়া।

(১০) নামাজ এবং যাকাত এ দুইটি ফরজ আদায় করা।

উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বড় নিদর্শন গুলোর কয়েকটি নতুবা এছাড়া তাদের আরো অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে।

ভ্রান্ত দল এবং তাদের পরিচয়

যে সমস্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী তারা সকলেই গোমরাহ। কারণ তারা শরীয়তের মূল নীতি বাদ দিয়ে নিজেরা নতুন মূল নীতি আবিষ্কার করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কোরআন-হাদীস ছেড়ে নিজের যুক্তি-অনুমান-চিন্তা-মনোবৃত্তি ইত্যাদীকে নির্ধারক হিসেবে মেনে নেয়। তারা শরীয়তকে নিজেদের আবিষ্কৃত মূলনীতির মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিকৃত করে বসে। নিম্নে এমন কয়েকটি মৌলিক ভ্রান্ত দল এবং তাদের পরিচয় তুলে ধরা হল–

১। **রাওয়াফেজ** ঃ এর অপর নাম হল যায়দিয়া। এটি এমন একটি দল যার অনুসারীরা স্বীয় নেতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদেরকে রাফেজী বলার কারণ হল, প্রথমে তারা হযরত আলী (রাযিঃ)-এর পর পৌত্র যাইদ বিন আলীর হাতে বাইআত গ্রহণ করে ছিলেন। পরে তারা তার নিকট আবেদন করেন যে, আপনি শাইখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এবং ওমর (রাযিঃ)-এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করুন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে তারা তাকে ছেড়ে চলে যান।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকে। (২) হযরত আলী (রাযিঃ) ব্যতীত সকল সাহাবীকে বিশেষত হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত যুবাইর (রাযিঃ) কে গালমন্দ করে। (৩) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর উপর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) কে প্রধান্য দেয়। (৪) একিই শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে। (৫) নামাজের জন্য ইকামত এবং জামাত সুন্নাত হওয়াকে অস্বীকার করে। (৬) মৌজার উপর মাসেহ করাকে অস্বীকার করে। (৭) তারাবীর নামাজকে অস্বীকার করে। (৮) নামাজে দাঁড়িয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখাকে অস্বীকার করে। (৯) মাগরিবের নামাজের জন্য তড়ি ঘড়ি করাকে অস্বীকার করে। (১০) রোজার ইফতার কে অস্বীকার করে।

২। **খাওয়ারেজ** ঃ যে কোন এমন দলকে বলা হয়, যার অনুসারীরা এমন কোন হক পন্থি নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে যার ব্যাপারে সবাই

একমত। চাই এ ধরণের বিদ্রোহ সাহাবাদের যুগেহক পন্থী ইমামের বিরুদ্ধে হোক, বা সাহাবাদের পর তাবেঈনদের বিরুদ্ধে হোক। সর্বপ্রথম এ রকম বিদ্রোহ হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে করা হয়। তাও করেন এমন কিছু লোক যারা সিফফীনের যুদ্ধে তার সাথে শরীক ছিলেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) কোন মুসলমান গোনাহ করলে তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে। (২) অত্যাচারী বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করে। (৩) হযরত আলী (রাযি) কে অভিশাপ দেয়। (৪) জামাত এবং নামাজের সুন্নাতকে অস্বীকার করে।

৩। **জাবারিয়া ঃ** এটি জাহামিয়ার একটি শাখা দল। এরা বান্দার কাজকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে তাকে আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করে।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) এরা বান্দাকে মাটি এবং পাথরের ন্যায় একান্ত বাধ্য মনে করে। কাজ কর্মের ব্যাপারে বান্দার কোন এখতিয়ার নেই বলে। যে সব কাজ কর্ম বান্দা থেকে পাওয়া যায় তা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই পাওয়া যায় এতে বান্দার কোন অধিকার নেই মনে করে। যেমন লম্বা এবং খাট হওয়ার ক্ষেত্রে তার কোন অধিকার নেই। সুতরাং তাকে তার কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে না। (২) ধন সম্পদকে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বস্তু মনে করে। (৩) বান্দা কাজ করলে আল্লাহ তায়ালার তওফীক পাওয়া যায় বলে। (৪) নবীজীর শারীরিক মেরাজ কে অস্বীকার করে। (৫) রুহ জগতের অঙ্গীকারকে অস্বীকার করে। (৬) জানাযার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

৪। **ক্বাদরিয়া ঃ** এটি জাবারিয়ার পরিপন্থি একটি দল তাকদীরকে অস্বীকার করে বিধায় এদেরকে কাদরিয়া বলা হয়। তারা বান্দাকে স্বীয় কর্মের স্রষ্টা মনে করে। কাদরিয়াদের ব্যাপারে হাদীসে ঘৃণার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাদেরকে এ উম্মতের অগ্নি পূঁজক বলা হয়েছে। তারা রোগাক্রান্ত হলে সেবা করতে এবং মারা গেলে জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) মূলত বান্দার সকল কর্মকাণ্ড তার ইচ্ছাধীন, এতে আল্লাহ তায়ালার কোন জোর জবরদস্তি নেই। (২) কোন কাজ বান্দার নিকট ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহ তায়ালার নিকট কুফরী হিসেবে গণ্য হতে পারে। (৩) বান্দার কাজের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা

তওফীক হয়। (৪) শারীরিক মেরাজ সঠিক নয়। (৫) রুহ জগতে কোন অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। ৬। জানাযার নামাজ ওয়াজিব নয়।

৪। **জাহামিয়া :** এ দলটির সম্পর্ক জাহাম বিন সফওয়ান সমরকন্দীর সাথে। জাহাম বিন সফওয়ান প্রথমে হারেছ বিন সুরাইজ- যিনি বনী উমাইয়ার রাজত্বের শেষের দিকে খোরাসানে বিদ্রোহ করে ছিলেন, তার সেক্রেটারী ছিলেন। সে সর্বপ্রথম বেদাতী কর্মকাণ্ড তরমযে প্রকাশ করে। পরে সালেম বিন আহবাজ তাকে মারব নামক স্থানে হত্যা করে। এরা মুতাজেলাদের মত আল্লাহ তায়ালার অনাদি গুণাবলী গুলো অস্বীকার করেন। তারা বলে, যে সব গুণাবলী দ্বারা বান্দাকে গুণান্বিত করা যায় সে গুলি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কে গুণান্বিত করা ঠিকনয়। নতুবা বান্দা এবং আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোন পার্থক্য থাকবেনা।

বৈশিষ্টাবলী : (১) ঈমানের সম্পর্ক নিছক অন্তরের সাথে মুখের সাথে নয়। (২) জান কবজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই করে থাকেন ফেরেস্তা নয়। কারণ জান কবজ কারী কোন ফেরেস্তা নেই (৩) রুহ জগতকে অস্বীকার করে (৪) মুনকার নাকীর ফেরেস্তাদ্বয়ের প্রশ্ন করাকে অস্বীকার করে। (৫) হাউজে কাউসরকে অস্বীকার করে, তারা বলে। এগুলো কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৬। **মারজিয়্যা :** এরা বলে, ঈমান নিয়ে কোন গোনাহ করলে ঈমানের ক্ষতি হয় না। যেমন-কুফর নিয়ে ইবাদত করলে কোন লাভ হয় না।

বৈশিষ্টাবলী : (১) আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, (২) আরশ আল্লাহ তায়ালার আবাস স্থল, (৩) নাজাতের জন্য ঈমান যথেষ্ট। সুতরাং ইবাদতের আলাদা কোন লাভ নেই এবং গোনাহ করলেও কোন ক্ষতি নেই। (৪) রমনীগণ বাগানের ফলের ন্যায়, সুতরাং যে কোন ধরণের রমনী ভোগ করা যাবে। বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ছহীহ আকীদা

নিঃসন্দেহে তাওহীদ তথা আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদ ঈমানের একটি মৌলিক অংশ। ইহা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারেনা। তাওহীদই সর্বপ্রথম জিনিস, যার মাধ্যমে মানুষ ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে এবং সর্বশেষ জিনিস যাকে নিয়ে মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

সুতরাং বুঝা গেল এটি ইসলামের প্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ। তাছাড়া সমস্ত আসমানী এবং সকল নবীর দাওয়াতের ভিত্তি এই তাওহীদের উপরই। মারফতের স্তর গুলোর মধ্যে তাওহীদই হচ্ছে সর্ব প্রথম স্তর। আর কালিমায়ে তাওহীদ এমন একটি কালেমা যা শত বছরের ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পর্যন্ত নিমিষে মুমিন বানিয়ে দেয়, যে পুরো জীবনটি ইসলামের বিরুদ্ধে কাটিয়ে পরে সৎ মনে কালেমাটি পাঠ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে। উপরন্ত কুফরী অবস্থায় সে যে সকল গোনাহের কাজ করে তাও মাফ করে দেয়া হয়। এ কালেমাটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যার জীবনের সর্বশেষ কথা লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মোট কথা তাওহীদের উপর ভিত্তি করেই যেহেতু মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে সুতরাং তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করেই ইহধাম ত্যাগ করা চাই যাতে শুরু শেষ উভয়টি তাওহীদের উপরে হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কোন কিছুই হয় না। এ জন্য ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন –

نَقُوْلُ فِيْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ مُعْتَقِدِيْنَ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ

আমরা আল্লাহ তায়ালার তাওফীকের উপর আস্থা রেখে তাঁর তাওহীদের আলোচনা শুরু করছি।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সত্তা-গুণাবলী এবং কাজ কর্মে একক যার কোন অংশীদার নেই। নেই কোন সমকক্ষ বরং তিনি একাই সকল ইবাদতের যোগ্য। তিনিই একমাত্র আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাই মুছান্নিফ (রহঃ) বলেন– إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاحِدٌ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একক তার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ তায়ালা বেনজীর

যেহেতু আল্লাহ তায়ালার কোন নজীর নেই। না সত্তাগত ভাবে না গুণগত ভাবে না কাজে কর্মে। না তার অনুশাসন এবং ফয়সালার মত অন্যকারো অনুশাসন বা ফয়সালা আছে। না তাঁর ধর্মের ন্যায় অন্য কোন ধর্ম আছে। তাই লেখক বলেন,

তার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত কথাটি বলে মুশাব্বেহা নামক একটি বিশেষ দলের রদ করা লেখকের উদ্দেশ্য। কারণ তারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীকে মাখলুকের গুণাবলীর সাথে তুলনা করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সর্বদিক থেকে অতুল্য।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ শক্তি এবং সক্ষমতার এমন কোন স্তর বাকি নেই, যা আল্লাহ তায়ালার মধ্যে নেই। সাধারণত দুর্বলতা এবং অজ্ঞতার কারণে কোন কাজের বেলায় মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো শক্তি এবং জ্ঞান উভয় দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ । সুতরাং বুঝা গেল তিনি অক্ষম নন, কোন জিনিস তাকে দুর্বল বা অক্ষম বানাতে পারেনা। কারণ শক্তি এবং অক্ষমতা একত্রিত হতে পারে না। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী নিজ ভাষায় বলেন–

وَلَاشَيْئَ يُعْجِزُهُ وَلَاإِلٰهَ غَيْرُهُ

কোন জিনিস তাকে অক্ষম বানাতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা অনাদি অনন্ত

আল্লাহর সত্তা সব সময় আছে সব সময় থাকবে। অর্থাৎ তার কোন শুরু শেষ নেই। তিনি অনাদি অনন্ত। অনাদি কথাটিকে কোরআনে আল আওয়্যাল বলে আর অনন্ত কথাটিকে আল আখের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, هو الاول والاخر হুবহু এ কথাটি মুসলিম শরীফের

হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "হে আল্লাহ আপনিই শুরু আপনার পূর্বে কোন কিছু ছিলনা। আবার আপনিই শেষ আপনার পরে কোন কিছু থাকবেনা।" এ দুটি কথা ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে,

قَدِيْمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ

তিনি অনাদি যার কোন শুরু নেই। তিনি চিরস্থায়ী যার কোন শেষ নেই,

অর্থাৎ তিনি এমন অনাদি সত্তা যার অস্থিত্ব অপরিহার্য। যার শুরু এবং শেষে অনস্তিত্ব আসা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালার ধ্বংস নেই

উপরোক্ত আলোচনায় যখন একথা প্রমানিত হল যে, তিনি অনাদি অনন্ত। এতে আপনা আপনি একথাও প্রমান হয়ে গেল যে, তার সত্তা কখনো ধ্বংস হবেনা। তবে তিনি ছাড়া অন্য সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। হাঁ এটি ভিন্ন কথা যে, একেকটি একেক ভাবে ধ্বংস হবে। অর্থাৎ কোন জিনিস খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে আর কোন জিনিস দেরীতে ধ্বংস হবে। তবে একথা ঠিক যে, সবকিছুকে ধ্বংসের সম্মুখিন হতে হবে। এক মাত্র আল্লাহ তায়ালার সত্তাই ধ্বংস থেকে মুক্ত থাকবে। কারণ আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব আবশ্যক অনস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং অস্তিত্বের গুণটি তার থেকে আলাদা হওয়াটাও সম্ভব নয়। এজন্য তার সব সময় জরুরী এক মুহুর্তের জন্যও ধ্বংস হওয়াটা সম্ভব নয়। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) এভাবে বলেনে যে,

لَا يَفْنٰى وَلَا يَبِيْدُ

তিনি শেষ ও হবেন না। ধ্বংসও হবেন না।

বান্দা কাজের কর্তা স্রষ্টা নয়

বাতিল পন্থীদের মধ্যে একটি দলের নাম হলো "কদরিয়া" আরেকটি দলের নাম হলো "মু'তাযিলাহ"। তাদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা সকল বান্দার জন্য ঈমানের ইচ্ছা করেন। কিন্তু মুমিনগণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঈমান গ্রহণ করেন। আর কাফেররা ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এর কারণ হলো, কাফেররা নিজেদের ব্যাপারে কুফরির যে ইচ্ছা করে তা প্রতিফলিত হয়, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় না। উক্ত দল দুটি অজ্ঞতাবশতঃ একথাটি বলে থাকে। কারণ তাদের ভয় হল, যদি

আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কুফরের ইচ্ছা করার কথা বলা হয়। তবে তা তার দিকে একটি ভুল ইঙ্গিত হবে। কিন্তু তাদের ভূলটি খলক "সৃষ্টি" এবং কসব "অর্জন বা কাজ" এর মাঝে পার্থক্য না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। খলক এবং কসবের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি একটি জীবন্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝা যেতে পারে। যেমন ধরুন যাইদ নামের একজন মুনীবের আমর নামের একজন গোলাম আছে। যাইদ তার গোলামকে একটি ভারী পাথর যেটি সে একাই উঠাতে সক্ষম, কিন্তু আমর নাড়াতেও পারবেনা তার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, এ পাথরটি নাড়ানো আমার আইনে বড় অপরাধ। যদিও বা কেউ তা উঠাতে পারবেনা, কিন্তু তারপরও পরীক্ষার জন্য এ নিয়মটি করা হয়েছে যে, কেউ পাথরটি উঠানোর উদ্দেশ্য হাত লাগালে আমি তা উঠিয়ে দিই। আর এ উঠানোটা তার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়। কেননা সে যদি উঠানোর ইচ্ছা না করত তবে আমাকে উঠিয়ে দিতে হতনা, আর তাকে অপরাধীও বলা হত না।

মোট কথা, যাইদের এ কানুন শোনার পর আমর স্বেচ্ছায় পাথরের কাছে গিয়ে পাথর উঠানোর জন্য হাত লাগায়। তখন যাইদ তার রীতি অনুযায়ী ততক্ষণাৎ পাথরটি উঠিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আমরের দোষ দিবে। যাইদের উপর দোষ চাপাবে না।

উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা যা বুঝতে পেরেছেন ঠিক সেভাবেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে ইচ্ছা এবং কাজ দান করে থাকেন। কিন্তু তা কর্ম সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো বান্দা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আল্লাহ তায়ালা কাজটি সৃষ্টি করে দেন।

সৃষ্টি এবং ইচ্ছার উল্লেখিত অর্থ না বুঝার কারণে মুতেজালারা উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয়। তার ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু হতে পারে না। সুতরাং তিনি মুমিনদের ব্যাপারে ঈমানের ইচ্ছা করেন আর কাফেরদের ব্যাপারে কুফরীর ইচ্ছা করেন। একথা যদি বিশ্বাস না করা হয় তবে অনেকগুলি কাজ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়াই সংঘটিত হওয়া বুঝা যাবে। যা নিতান্ত ভুল এবং আল্লাহ তায়ালার অক্ষমতার দলীল।

উল্লেখ্য, এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যে কোন কাজের ইচ্ছা করেন। এমনকি কুফরী এবং গোনাহের ও ইচ্ছা করেন। তবে কথা হলো

কুফরী এবং গোনাহের ইচ্ছা সৃষ্টি করণ হিসেবে শরীয়ত হিসেবে নয়। কারণ তিনি তা পছন্দ করেন না অর্থাৎ সে ব্যাপারে আদেশ ও দেন না। ইচ্ছা সম্পর্কিয় মুতেজালাদের উপরোক্ত উক্তিকে রদ করে ইমাম ত্বাহাবী বলেন, وَلَا يَكُونُ اِلَّامَا يُرِيدُ

তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়।

আল্লাহ তায়ালা কল্পনা এবং বিবেচনার উর্দ্ধে

সাধারণত মানুষ মেধা এবং অন্যান্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য শক্তি দ্বারা কখনো সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করে। আবার কখনো শুধুমাত্র ধারণা নেয়। কিন্তু মানবীয় জ্ঞানের একটি সীমা আছে, উক্ত সীমানাকে ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং নিজের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা। বিবেক-বিবেচনা এবং কল্পনা ইত্যাদি দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে বুঝা, অনুভব করা মোটেই সহজ নয়। কেননা, এগুলি সব সীমিত জনিস এবং এগুলি দিয়ে শুধুমাত্র শরীর বিশিষ্ট এবং দৃশ্যমান বস্তুকেই অনুভব করা যায়। সুক্ষ এবং নূরানী শরীর গুলো অনুভব করা সম্ভব হয় না। যেমন নাকি হাদীসে জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উক্ত নেয়ামত গুলো এমন যে, তা চোখ দিয়ে কেউ পূর্বে দেখেনি। কানেও শোনেনি কারো কল্পনায়ও কোন দিন আসেনি। সুতরাং জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে যখন এ ধরনের কথা বলা হয়েছে, অথচ সে গুলো দেহ বিশিষ্ট এবং মাখলুক। তাহলে ঐ নূরানী এবং সুক্ষ সত্তা যিনি শরীর বিশিষ্ট নন এবং স্বয়ং স্রষ্টা তাকে কিভাবে মানবীয় ধ্যান ধারণা এবং কল্পনা দিয়ে অনুভব করা সম্ভব হবে। হাঁ তাকে তার গুণাবলী যেমন ঃ তিনি একক, স্বয়ং সম্পূর্ণ ইত্যাদি গুণ দ্বারা চিনা এবং অনুভব করা সম্ভব। তাকে কেউ অনুভব করতে না পারলেও কিন্তু তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন এবং সুপ্ত জ্ঞানের চাবিও তার হাতে। একথাটি লেখক বলেন,

لَاتَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَاتُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ

অনুবাদ ঃ মানবীয় কল্পনা তাঁর নাগাল পায়না এবং মানবীয় জ্ঞান তাকে অনুভব করতে পারেনা।

ব্যাখ্যা ঃ একথাটি তর্কশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব সুল্লামে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার কল্পনা মানবীয় কল্পনা শক্তির বাইরে। না চক্ষু তাকে অনুভব করতে পারে, না জ্ঞান এবং ধারনা তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার কোন সাদৃশ্যতা নেই

যদিও বা অস্থিত্ব-শক্তি-জানা-শোনা-দেখা ইত্যাদী গুণাবলী বান্দাদের মধ্যে ও বিরাজমান। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব বান্দার অস্তিত্বের মত নয় এবং আল্লাহর জানা বান্দার জানার মত নয়। অন্যান্য গুণাবলীর একিই অবস্থা। উপরোক্ত কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালার মধ্যে এ সকল গুণাবলী নেই বরং সব ধরণের গুণাবলী আছে তবে সেগুলো বান্দার গুণাবলীর সাদৃশ্য নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী চিরস্থায়ী এবং সর্বত্র বিরাজমান। পক্ষান্তরে মাখলুকের গুণাবলী ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত।

আল ফেকহুল আকবর নামক গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোন মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যতা রাখেনা। তার সাথেও কোন মাখলুক সাদৃশ্যতা রাখেনা। এরপর তিনি বলেন, তার সকল গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর বিপরীত। তিনি জানেন, কিন্তু আমাদের জানার মত নয়। তিনি শক্তি রাখেন কিন্তু আমাদের শক্তি রাখার মত নয়। তিনি দেখেন, কিন্তু আমাদের দেখার মত নয়। তবে একথাটি মুশাব্বাহা পন্থিরা মানেনা। তারা স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে তাই তাদের রদ করে গ্রন্থকার বলেন ঃ لَا يُشْبِهُهُ الْأَنَامُ

মাখলুক তার সাদৃশ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী

আল্লাহ তায়লার কোন সাদৃশ্য নেই, তিনিও কারো সাদৃশ, নন। আমরা সৃষ্টি জীবের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই যে, একেক জনের মধ্যে একেক ধরণের দুর্বলতা এবং অক্ষমতা রয়েছে। যেমন- মৃত্যুবরণ করা, নিদ্রা যাওয়া যা এক হিসেবে মরার মতই। সুতরাং যে সত্তার কোন সাদৃশ্য নেই, তার জন্য জরুরী হলো মাখলুকের গুণাবলী থেকে আলাদা থাকা। তাঁর যেন মৃত্যু না হয়, তন্দ্রা এবং নিদ্রা না আসে। কারণ এসকল অবস্থা তার সত্তাগত পরাকাষ্ঠার পরিপন্থি। এতে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের অক্ষমতা এবং দুর্বলতা পূর্ণ গুণাবলী থেকে পবিত্র। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ তিনি চির ীব-চিরস্থায়ী তাকে কোন ধরনের তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করেনা।

মোট কথা, আল্লাহ তায়ালার সত্তা সকল অবস্থা থেকে পবিত্র। কেননা তিনি যদি চিরঞ্জীব না হতেন তাহলে চিরস্থায়ী কিভাবে হতেন। এ ছাড়া

তিনি যদি নিদ্রা ইত্যাদীর সম্মুখিন হতেন তবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হতো, একথাটি লেখক বলেন.

حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَيُّومٌ لَا يَنَامُ

তিনি চিরঞ্জীব কখনো তার মৃত্যু হবে না। তিনি চিরস্থায়ী কখনো ঘুমান না।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা রিযিকদাতা

যখন একথাটি জানা হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি সকল কাজের শক্তি রাখেন। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে অসংখ্য অক্ষমতা এবং দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং এতগুলি দুর্বলতা নিয়ে মানুষের পক্ষে নিজে-নিজে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। তাই তাদের এবং অন্য সৃষ্ট জীবের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা দরকার। আর যিনি সৃষ্টি কর্তা হবেন। তিনি শক্তি, প্রজ্ঞা জ্ঞান গরিমা সর্বদিক থেকে এমন হওয়া চাই, যার সামনে অন্যসব শক্তি পরাজয় বরণ করবে বরং সবার শক্তি তার সৃষ্ট হওয়া চাই। এ সকল গুণাবলী থাকলে তিনি সৃষ্টি কর্তা হতে পারবেন। তবে কথা হল তিনি নিজের স্বার্থে মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীব সৃষ্টি করবেন না। কারণ এটি তার স্বয়ং সম্পূর্ণতার পরিপন্থি। সুতরাং এ বিশ্ব ভূমন্ডল সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ব্যক্তিগত লাভ অর্জন উদ্দেশ্য না হয়ে অন্যকিছু হওয়া চাই। যেমন তার অনুকরুণা এবং ক্ষমার গুণ প্রকাশ করা ইত্যাদি। এ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা একাই সৃষ্টি কর্তা এতে তার সাথে কেউ শরীক নেই। কারণ সৃষ্টির অর্থ হলো অস্তিত্বদান করা। আর ইহা এক মাত্র তার জন্যই সম্ভব, যার অস্তিত্ব সত্তাগত। যেহেতু মাখলুকের অস্তিত্ব সত্তাগত নয়, বরং সে অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী। সুতরাং মাখলুক কিভাবে অপরকে অস্তিত্ব দান করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ জিন এবং মানুষকে ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীব জন্ম নেবার পর তারা রুজীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের রুজীর ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে তার কোন সমস্যা হয়না। কারণ তাঁর শক্তির গুণ এমন যে, তিনি যখনই কোন কিছু করার ইচ্ছা

করেন তখন শুধুমাত্র (হয়ে যাও) এ কথাটি বলেন। সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসটি হয়ে যায়। এ কথাটি গ্রন্থকার বলেন,

خَالِقٌ بِلَاحَاجَةٍ رَازِقٌ بِلَامَؤُنَةٍ

নিজের প্রয়োজন ছাড়াই তিনি মাখলুকদের সৃষ্টি করেন এবং কোন ধরনের কষ্ট ছাড়াই রুজির ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুদানকারী পুনরুত্থানকারী

পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর উপর সক্ষম হওয়াটা বুঝা গিয়েছে। আর পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়ার দাবী হলো, কারো মৃত্যু বা জন্মে ভয় না করা। মারা এবং বাঁচানো সবকিছু তাঁর আয়ত্বাধীন তিনিই জীবন-মরণের মালিক। তিনি যেমন কোন ধরনের কামনা বাসনা ছাড়াই মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মৃত্যুদান কারীও। কারো জীবন কেড়ে নিতে তিনি কাউকে ভয় করেন না। তিনি ভয় করবেন বা কেন? কারণ ভয় করা হয় কোন কিছুর উপর পূর্ণকর্তৃত্ব না থাকলে তার তো সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এবং সমস্ত মাখলুককে তিনি নমুনা ছাড়াই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। তাই পুনরায় জীবিত করার মধ্যে তার কোন কষ্ট হতে পারেনা।

মোট কথা তিনি নতুনভাবে সৃষ্টি করতে যেমন সক্ষম তেমনি পরে ধ্বংস করে দিতে ও সক্ষম। আবার পুনরায় জীবিত করতে ও সক্ষম। উল্লেখ্য, মানুষকে পুনর্জীবিত করার আক্বীদা রাখা ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি। কেউ এটি অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। একথাটি লেখক বলেন,

مُمِيتٌ بِلَامَخَافَةٍ بَاعِثٌ بِلَامَشَقَّةٍ

তিনি নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী, কোন কষ্ট ছাড়াই পুনরুত্থান কারী।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা

আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা অনাদি এবং চিরস্থায়ী, তার উপর কোন দিন অনস্থিত্ব আসেনি সামনেও আসবেনা। আর একথাটিও স্বতসিদ্ধ যে, তার সত্তা সব সময় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত থাকে। কারণ সকল গুণাবলীর অধিকারী সত্তাকেই আল্লাহ বলা হয়। সুতরাং প্রয়োজন হলো আল্লাহ্ তায়ালা যেমন অনাদি অনন্ত তাঁর গুণাবলী গুলিও অনাদি অনন্ত হওয়া, নতুবা গুণাবলী গুলি আল্লাহ তায়ালার সত্তা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া বুঝা যাবে। অথচ তা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কারণ উহা আবশ্যকতা এবং পুরানত্বের পরিপন্থি।

তাঁর গুণাবলী অনাদি অনন্ত

বস্তুত, তার সত্তাও অনাদি অনন্ত এবং তার গুণাবলীও অনাদি অনন্ত। যখন একথাটি প্রমাণ হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তার গুণাবলী অনাদি। আর এ অনাদিত্বটা এমন একটি গুণ যা তার সত্তা থেকে পৃথক হতে পারে না। এতে একথাটিও প্রমাণ হয়ে গেলে যে, আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী প্রমাণের জন্য মাখলুকের কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির পর আল্লাহ তায়ালা যে সব গুণে গুণান্বিত হয়েছেন, মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে ও তিনি সে সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। মাখলুক সৃষ্টির পর তিনি নতুন কোন গুণে গুণান্বিত হননি। তেমনি মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তার কোন গুণে ঘাটতি আসবেনা। যেমন ধরুন তিনি বর্তমান যেমন সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টির সূচনার পূর্বেও তিনি সৃষ্টি কর্তা ছিলেন। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির কারণে তাকে সৃষ্টি কর্তা বলা হচ্ছেনা। বরং সৃষ্টি ছাড়াই তার জন্য সৃষ্টির গুণটা প্রমানিত।

মোট কথা আল্লাহ্ তায়ালার যে সবগুণাবলী রয়েছে, সেগুলোর সাথে তিনি গুণান্বিত হওয়ার জন্য উক্ত গুণগুলি প্রকাশ্যে পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। যেমন মনে করুন মুফতী বলা হয়, ঐ ব্যক্তিকে যে, মৌখিকভাবে বা লিখে ফত্ওয়া প্রদান করেন। কিন্তু এমন কোন মুফতী যিনি ফত্ওয়া দেয়ার যোগ্যতা রাখেন, বা ফত্ওয়া দেয়া তার কাজ। তিনি যখন ফত্ওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকেন তখনও তাকে মুফতী বলা হয়। ডাঃ-হাকীম-লেখকের ক্ষেত্রেও এ নিয়মটি প্রযোজ্য।

সুতরাং একজন সাধারণ মাখলুকের গুণের যখন এ অবস্থা, তখন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী নিয়ে আর কোন প্রশ্নই উঠেনা। অর্থাৎ তিনি তার গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তা প্রকাশ্যে পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। একথাটি লেখকের ভাষায় শুনুন,

مَازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِ يْمًاقَبْلَ خَلْقِهِ - لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِّنْ صِفَاتِهِ

তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব থেকেই স্বীয় গুণাবলীর সাথে বিদ্যমান ছিলেন। সৃষ্টির পরে তার গুণাবলীর মধ্যে নতুন কোন গুণ বৃদ্ধি পায়নি।

وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَالِكَ لَايَزَالُ عَلَيْهَا اَبَدِيًّا

তিনি স্বীয় গুণাবলী নিয়ে যেমন অনাদি তেমনি সে গুলো নিয়ে অনন্ত হয়ে থাকবেন। অর্থাৎ তিনি অনাদিও অনন্তও তার সত্তা এবং গুণাবলীর কোন শুরু শেষ নেই।

لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اِسْتَفَادَ اِسْمَ الْخَالِقِ وَلَابِاِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اِسْتَفَادَإِسْمَ الْبَارِئ لَهُ مَعْنَى الرُّبُوْبِيَّةِ وَلَامَرْبُوْبَ وَمَعْنَى الْخَالِقِيَّةِ وَلَامَخْلُوقَ

মাখলুক সৃষ্টির কারণে তিনি সৃষ্টি কর্তার নামটি পাননি আর এ বিশ্ব জগত সৃষ্টি করার কারণে নব আবিষ্কারক নামটি অর্জন করেননি। প্রতি পাল্য বস্তু এবং মাখলুক ছাড়াও তার মধ্যে প্রতি পালন এবং সৃষ্টি করার গুণ বিদ্যমান।

وَكَمَا أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى بَعْدَ مَااَحْيَا اِسْتَحَقَّ هٰذَا الْاِسْمَ قَبْلَ إِحْيَاءِ هِمْ كَذَالِكَ اِسْتَحَقَّ اِسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ أِنْشَائِهِمْ

আর যেমন তিনি মৃতদের জীবিত করার পর "জীবন দান কারী" গুণে গুণান্বিত, তেমনি কোন কিছুকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এ নামের উপযুক্ত। অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টির আগেও 'সৃষ্টি কর্তা' নামটির অধিকারী ছিলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তায়ালার সকল গুণাবলী অনাদি, এটি কিভাবে সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

ذٰلِكَ بِأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ইহা অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকাল থেকে তার গুণাবলী সাব্যস্ত থাকাটা এ হিসেবে যে, তিনি সব কিছুর উপর সক্ষম।

মোট কথা, আল্লাহ তায়ালা যে কোন ব্যাপারে সক্ষম, সকল কিছু তার মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। একথাটি লেখক বলেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ- وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ- لَايَحْتَاجُ إِلٰى شَيْءٍ- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ- وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

সকল জিনিস তার মুখাপেক্ষী, আর প্রতিটি কাজ তার জন্য সহজ। তিনি কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তিনি সব কিছু শোনেন এবং দেখেন।

একথাটি বলে মুআত্তালা ঃ বেকারের দল, নামক ঐ দলটির রদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীকে অস্বীকার করে।
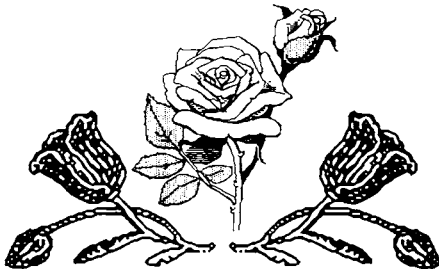
চতুর্থ পাঠ

আল্লাহ তায়ালা নিজজ্ঞানে মাখলুক বানিয়েছেন

এ কথাটি স্বত সিদ্ধ যে, না জেনে কোন ক্ষুদ্র কাজ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এতবড় পৃথিবী এবং বিশাল কারখানা সৃষ্টি করা এবং তা পরিচালনা করা জ্ঞান ছাড়া কিভাবে সম্ভব। তাই আল্লাহ তায়ালার মধ্যে অন্যান্য গুণাবলীর ন্যায় জানার গুণটিও থাকা আবশ্যক। কারণ না জেনে কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) এ কথাটি বলেন,

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهٖ

তিনি নিজ জ্ঞানে মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন

আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করে প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ করে দিয়েছেন। উক্ত সীমানার ভেতরে থেকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা প্রকাশ পায়। তারা নিজেদের সীমানা থেকে বের হতে পারে না, আবার নিজেদের সীমানায় থেকে র্কম কান্ড চালাতে অক্ষম ও হয়না।

মোট কথা তিনি প্রতিটি জিনিসকে এমন পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছেন যে, সেগুলোর প্রকৃতিগত সামঞ্জস্যতার মধ্যে সামান্য বেশ কম বা হেরফের করার অবকাশ রাখেনি। বড় বড় দার্শনিকরা দর্শন সমুদ্রের অতল গহবরে ডুব দিয়ে পরিশেষে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, নিপুনতম সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ কতইনা কল্যাণময়। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের জন্য যেমন সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তেমনি প্রতিটি জিনিস যে সকল বিষয়ের সম্মুখিন হবে তাও তিনি তার জ্ঞান ভান্ডারে হেফাজত করে রেখেছেন। পৃথিবীর বয়স এবং কেয়ামতের দিন তারিখ তার ইলমে রয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিস নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যাবে তাতে কোন ধরনের আগ পিছ হবে না। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَقَدَّرَ لَهُمْ اَقْدَارًا

তিনি মাখলুকের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ ভাগ্য লিখেদিয়েছেন, اقدار শব্দটি قدر এর বহুবচন অর্থ, সীমা-নির্দিষ্ট সময়।

তিনি মাখলুকের হায়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন

সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রতিটি জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে, আর সেগুলো ধ্বংস হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়ও আছে। যার মধ্যে আগ পিছ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে বা যে কোন জিনিস ধ্বংস হয় তা সময় মতই ধ্বংস হয়। চাই সে নিজে নিজেই মৃত্যুবরণ করুক বা অন্য কেউ তাকে হত্যা করুক বা ধ্বংস করে দিক। একথা স্বীকার করতে হবে যে, কাজটি সময় মত হয়েছে। তবে হত্যাকারী নিজের কৃত কর্মের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالاً

আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। آجال শব্দটি أجل এর বহুবচন অর্থাৎ কোন বস্তুর নির্ধারিত বয়স।

তার কাছে কোন কিছু গোপন নয়

রাওয়াফেয এবং কাদরিয়াদের অন্যান্য বাজে কথা গুলোর মধ্যে এটাও একটি যে, তারা বলে কোন বস্তু সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু তাদের একথাটি নিতান্তই ভুল। আল্লাহ তায়ালা তো দৃশ্য অদৃশ্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন। যা গত হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ ইলম তার কাছে আছে। সৃষ্টির পরে যেমন- তিনি তার পুরো খবর রাখেন ঠিক তেমনি সৃষ্টির পূর্বেও সে সম্পর্কে তার সম্যকজ্ঞান থাকে। আর বান্দার কর্ম কান্ডের সৃষ্টি কর্তাও যেহেতু খোদ আল্লাহ তায়ালা, তাই তাদেরকে সৃষ্টি করার আগেই তাদের ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে তিনি জানেন। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ اَنْ خَلَقَهُمْ وَعَلِمَ مَاهُمْ عَامِلُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَهُمْ

মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে তার নিকট কোন জিনিস গোপন থাকেনা এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে তাদের ভবিষ্যৎ কার্য কলাপ সম্পর্কে তিনি জানেন।

তিনি আনুগত্যের আদেশ দেন পাপ কাজে নিষেধ করেন

আল্লাহ তায়ালা যে সব মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে কিছু মাখলুক আছে যারা আল্লাহ তায়ালার আহকামের নিগড়ে আবদ্ধ। আর কিছু মাখলুক আছে যারা ঐ সব মাখলুকের খাদেম। এদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার আহকামের নিগড়ে আবদ্ধ তাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ইবাদতের রীতি পছন্দনীয় হওয়া জরুরী। আর পছন্দনীয় রীতি আদেশ-নিষেধ ছাড়া সম্ভব নয়। এই জন্যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন এবং পাপাচারে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ

তিনি তাদেরকে স্বীয় ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নাফরমানী করতে নিষেধ করেছেন সব কিছু তার ইচ্ছাধীন।

সবকিছু তার ইচ্ছাধীন

যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর মালিক এবং হর্তা-কর্তা। তাই এর জন্য জরুরী হলো তিনি যা চাইবেন তাই তার মালিকানায় থাকবে, তার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু প্রকাশ লাভ করবে। আর ভাগ্য লিপিতে যা লিপিবদ্ধ করা আছে, সে অনুযায়ী সমস্ত কাজ সময় মত হতে থাকবে। তিনি যা চাইবেন তা হবে আর যা চাইবেন না তা হবেনা।

মোট কথা তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবে না। কাফেরের কুফরী ফাসেকের নাফরমানী সবই আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত এবং তার ইচ্ছাধীন। উল্লেখ্য যে, কাফেরের কুফরী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন হলেও এর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কুফরীর উপর সন্তুষ্ট নন। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَامَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّامَاشَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ

প্রতিটি জিনিস তার সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়, এক্ষেত্রে তার ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয় বান্দার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। সুতরাং বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয় আর যা চাননা তা হয় না। সবকিছু তার অনুগ্রহ এবং ন্যায় বিচার অনুযায়ী হয়।

উপরের আলোচনায় একথা প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সুতরাং প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টি উৎকৃষ্ট হতে বাধ্য। তবে একথাটি অনস্বীকার্য যে, বান্দার সকল কর্মকান্ড নিজেরই উপার্জন। আর উপার্জনের মূলনীতি হলো, উপার্জন যদি ভাল হয় তবে কাজটিকে ভাল বলে বিবেচনা করা হয়। আর উপার্জন মন্দ হলে কাজকেও মন্দ বলা হয়। এখানে হেদায়াত গোমরাহী উভয়ের সৃষ্টিকারী তিনিই। কিন্তু বান্দা গোমরাহ হলে দোষ হবে তার। কারণ বান্দা আহকামের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়ার ভিত্তি হলো শক্তি এবং ইচ্ছা এই দুটি বস্তুর অধিকারী হওয়া। সুতরাং আদেশ নিষেধ ছেড়ে দিলে সে গোনাহগার এবং অপরাধী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন কাজ করা আবশ্যক নয়। অনুরূপভাবে তারজন্য ঐ কাজ করাও জরুরী নয় যার মধ্যে বান্দার লাভ এবং উপকার নিহিত রয়েছে। বরং তিনি যদি বান্দাদেরকে হেদায়াত দান করেন এবং তাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তবে তা হবে তার ইনসাফ এবং অনুগ্রহ। আর যদি তিনি এর উল্টো করেন তবে তা হবে তাঁর ইনসাফ। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِىْ فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِىْ عَدْلًا

আল্লাহ তায়ালা যাকে চান হেদায়াত দান করেন রক্ষা করেন এবং অনুগ্রহ করে মসীবত দূর করে দেন ইহসান পূর্বক। আর যাকে চান গোমরাহ বানিয়ে দেন, সাহায্য করা ছেড়ে দেন এবং বিপদে ফাঁসিয়ে দেন। সুতরাং বুঝাগেল এ পৃথিবীতে যা কিছু হবে অথবা তার অনুগ্রহে হবে অথবা তার ন্যায় বিচার অনুযায়ী হবে। একথাটি লেখক বলেন,

وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُوْنَ فِىْ مَشِيَّتِهٖ بَيْنَ فَضْلِهٖ وَعَدْلِهٖ

সমস্ত লোক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তার অনুগ্রহ এবং ইনসাফের মাঝে পরিবর্তিত হতে থাকে।

অতএব ঈমানের পথ খুঁজে পাওয়া তারই ইচ্ছাধীন আর এটি তাঁর অনুগ্রহ। অনুরূপভাবে কাফেরের কুফরী এবং গোমরাহী তারই ইচ্ছাধীন আর এটি তার ইনসাফ।

আল্লাহ তায়ালা অপ্রতিদ্বন্দ্বি

উপরের বর্ণনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বান্দা এবং তাদের ক্রিয়া কলাপের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু মুতাজেলা সম্প্রদায় বান্দাকে নিজের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা মানে অথচ বান্দাকে তাদের স্বীয় কার্যকলাপের স্রষ্টা মানলে দুটি অসুবিধা সৃষ্টি হবে–

প্রথমতঃ তখন বান্দা এবং আল্লাহ উভয়েই স্রষ্টা হয়ে যাবে, ফলে সৃষ্টির কাজে আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দা শরীক থাকা বুঝা যাবে। অথচ আল্লাহ তায়ালার কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয়তঃ যদি বান্দাকে তাদের কার্যকলাপের স্রষ্টা মানা হয়, তবে বান্দা চাইবে একটি আর আল্লাহ তায়ালা চাইবে আরেকটি। উদাহরণস্বরূপ বান্দা চাইবে কুফরী করতে। আর আল্লাহ তায়ালা তার ঈমানের ইচ্ছা করবেন। যেমন মুতাজেলারা এ ধারনা পোষণ করে।

সুতরাং, মুতেজালাদের কথা অনুযায়ী কাফের ব্যক্তি নিজের কুফরীর ইচ্ছা করে সফল হওয়া বুঝা যাবে। আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া বুঝে আসবে। এমতাবস্থায় কাফের ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তায়ালার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি বা সাদৃশ্য ও শরীক নেই। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ

তিনি প্রাতিদ্বন্দ্বি এবং নযীর থেকে পবিত্র অর্থাৎ তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিও নেই যে তার সাথে মোকাবেলা করবে বা তার বিরোধিতা করবে। আর তার কোন সমকক্ষ বা শরীক ও নেই যে তার কাজে দখল দিবে।

اضداد শব্দটি ضد এর বহু বচন অর্থ-প্রতিদ্বন্দ্বি-বিরোধী। আর انداد শব্দটি ند এর বহুবচন অর্থ-সাদৃশ্য-শরীক।

আল্লাহ তাআলার ফয়সালা অবধারিত

আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা যখন অনস্বীকার্য-স্বতসিদ্ধ এবং তার ক্ষমতার সামনে সবাই অক্ষম। সুতরাং কোন শক্তিই তার ফয়সালাকে ভন্ডুল

করতে পারবেনা। আর কোন শক্তিই তার হুকুমকে এড়াতে পারবেনা। বরং প্রতিটি জিনিস সময়মত তার ফয়সলা অনুযায়ী হতে থাকবে। কোন শক্তি তার ফয়সালার উপর জয়ী হতে পারবে না।

মোট কথা তাঁর সৃষ্টিগত হুকুম এবং ফয়সলা অনড়-অবিচল। সময় হলে আবার কার সাধ্য যে এক মিনিটের জন্য ফয়সলাটি মুলতবী করে দিবে। মানুষ যত কৌশল গ্রহণ করুকনা কেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার বিধি ব্যবস্থা সব কিছুর উপর জয়ী। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

لَارَادَّ لِقَضَائِهٖ وَلَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ وَلَاغَالِبَ لِأَمْرِهٖ۔

তার ফয়সলাকে রদ করার মত কেউ নেই। তার হুকুমকে বিলম্বিত করার মত ও কেউ নেই। তার হুকুমের উপর প্রধান্য বিস্তার কারীও কেউ নেই।

মুসলমানদের উচিত হলো, তাদের সামনে সঠিক প্রমাণাদীর মাধ্যমে সৎ আক্বীদাগুলো ফুটে উঠলে তা গ্রহণ করা। এখানে আক্বীদা সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হয়েছে সবকিছু আল্লাহ তায়ালার ফয়সলা এবং ইচ্ছার অধীন। অতএব মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো ঐ সকল কথার উপর ঈমান আনা। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

اٰمَنَّا بِذَالِكَ كُلِّهٖ وَاَيْقَنَّا اَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهٖ

উপরোক্ত সকল কথার উপর আমরা ঈমান রাখি এবং এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করি যে, এসব জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

পঞ্চম পাঠ

নবীদের পরিচয় এবং প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের উপর তাঁর ইবাদত করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। কিন্তু ইবাদতের পছন্দনীয় পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আবার আল্লাহ তায়ালা নিজে কোন বড় বা ছোট লোককে একথা বলা যে, ইহা আমার হুকুম-এ নিয়মটাও প্রজ্ঞা পরিপন্থি। ফলে এমন কিছু মমনোনিত ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। যারা আত্মিক নূর দ্বারা আল্লাহর মাকামের সাথে সম্পর্ক রাখে আর শারীরিক ভাবে জড় জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, যাতে এদের মাধ্যমে বান্দাদের নিকট আল্লাহর আহকাম পৌঁছানো সম্ভব হয়। ঐ সকল মনোনিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন নবীগণ। যেহেতু নবুওয়াত কোন উপার্জিত বস্তু নয়। বরং আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ মাত্র। আর নবীরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তাই এ নির্বাচনে ভুলের কোন সম্ভাবনা নেই। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়েছে, আর এটি আমাদের প্রিয় নবীর উপর এসে শেষ হয়েছে। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ الْمُصْطَفٰى
وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلُهُ الْمُرْتَضٰى

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার মনোনিত বান্দা এবং পয়গম্বর এবং পছন্দনীয় রাসূল।

খতমে নবুওয়াত ঃ একটি সমীক্ষা

ইসলামের মৌলিক যে তিনটি আক্বীদা রয়েছে, তন্মধ্যে রেসালাতের আকীদাটি একটি প্রধান আক্বীদা। আর রেসালাতের উপর ঈমান আনা খতমে নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা ছাড়া হতেই পারেনা। কারণ রেসালাতের আক্বীদার ভেতর খতমে নবুওয়াতের আক্বীদাটি নিহিত। কেননা রেসালাত হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানা এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা খাঁটি মনে করা। উপরন্ত খতমে নবুওয়াতের আক্বীদা অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হওয়া তারপরে পৃথিবীতে কোন

নবী না আসা এবং নবুওয়াতের যে কোন দাবীদার মিথ্যাবাদী হওয়া এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে সাহাবাদের যুগ থেকে শুরু করে আজপর্যন্ত যুগে যুগে সকল মুসলমানদের মতৈক্য পাওয়া গিয়েছে।

সুতরাং খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝে নেয়া দরকার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

উপরোক্ত আয়াতে শেষ নবী কথাটি বুঝানোর জন্য خاتم النبين বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে خاتم শব্দটি দুভাবে পড়া যেতে পারে। ت এর নীচে زير বা ت এর উপর زبر দিয়ে। প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে সমাপ্তকারী আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে মোহর। এ অর্থের সাথে প্রথম অর্থের মিল রয়েছে। কারণ কোন বস্তুকে সমাপ্তিতে পৌছার পরই মোহর করা হয়। সুতরাং خاتم النبين অর্থ নবীগণের পরম্পরা সমাপ্ত কারী। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ উপাধি। আর ইহা এমন একটি উপাধি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য দাবী ও করেছেন। কিন্তু তার পূর্বের কোন নবী বা রাসূল তা দাবী করেননি। কারণ এ উপাধিটি আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে তাকেই দান করেছেন। আবার তাও প্রশংসা হিসেবে নয় বরং আকীদা হিসেবে অর্থাৎ এর আকীদা রাখা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।

خاتم النبين ইহা এমন একটি গুণ, যা নবুওয়াত এবং রেসালাতের সকল পরাকাষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে সর্বোচ মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা বুঝায়। কারণ মানবীয় সকল প্রকার পরাকাষ্ঠা নবুওয়াতের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে আছে। আর নবুওয়াতের সকল পরাকাষ্ঠা খতমে নবুওয়াতের ভেতর পুঞ্জীভূত। সুতরাং যিনি শেষ নবী হবেন তিনি আদি অন্ত সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী হবেন। এছাড়া যে কোন জিনিস ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করার পর চরম শিখরে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে। আর শেষ পরিণতি যা হয় তাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা যে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নবীদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, সে সব উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

প্রেরণের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। মানবীয় বিশ্ব ওহীর জ্যোতি এবং ফেরেস্তাদের নূর দ্বারা যতটুকু সমৃদ্ধশালী হওয়া সম্ভব ছিল তা তার মাধ্যমে হয়েছে। মনুষ্যত্ব পূর্ণতার সকল দিক বিশ্বের সামনে ইলমী এবং আমলী ভাবে তারই মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

নবীরা এসে দুনিয়াতে মনুষ্যত্ব পূরণের জন্য ঐ সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা মানুষ নিজের চেষ্টা এবং শক্তি দিয়ে অর্জন করা এবং নিজের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সে পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। মানবীয় চিন্তার পাখি গুলোও সে পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে না। কারণ মানবীয় উদ্যম যেখানে শেষ হয়ে পড়ে এবং আসমানী দিক নির্দেশনা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়ে মানুষের হেদায়তের সমস্ত পন্থা বলে দিয়েছেন। এরপর কোন ধরনের আমলের জন্য অন্য কারো অপেক্ষায় থাকার অবকাশ নেই।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাত সর্বশেষ রেসালাত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালার একটি নেয়ামত মানুষ পূর্ব থেকে পেয়ে আসছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। বরং তার অর্থ হল, যে নেয়ামতটি পূর্বে পরিবর্তন শীল ছিল তা এখন স্বীয় পরিপূর্ণতা নিয়ে মানুষের নিকট চির দিনের জন্য স্থির হয়ে গেলে। আল্লাহ তায়ালা নবুওয়াতের ইতি টেনে কোন নেয়ামতকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেননি, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত থেকে স্থায়ীভাবে উপকৃত হওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। যেমন-নাকি সূর্য উদিত হওয়ার পর অন্যকোন বাতির প্রয়োজন হয় না। কারণ সূর্যের আলোতে প্রতিটি জিনিস উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের সূর্য উদিত হওয়ার পর মানব জাতি অন্যকোন বাতির মুখাপেক্ষী নন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাত শেষ হয়নি বরং তার উপর রেসালাতের ইতি হয়েছে। তাঁর রেসালাত বলবৎ আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তবে এ ধরনের রেসালাতের অন্য কেউ পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের সূর্য কখনো স্তিমিত হওয়ার মত নয়। যার ফলে রেসালাতের নতুন কোন সূর্য উদিত হওয়ার প্রয়োজন হত।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য খতমে নবুওয়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ঃ এমনি তো মুসলমানদের জন্য অনেকগুলো কথা মানা এবং পালন করা আবশ্যক। তাছাড়া ঈমান তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত শিক্ষা মানারই নাম। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তন্মধ্যে খতমে

নবুওয়াতের আকীদাটিই মুসলিম ঐক্যের মূলকেন্দ্র বিন্দু। পরস্পর যত মত পার্থক্য থাকুকনা কেন, মানব জাতির একতাবদ্ধ হওয়ার পন্থা একটাই। তা হলো শুধুমাত্র এক নবুওয়াতের পাশে এসে দাড়ানো। একটি জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত একক জাতি বলে আখ্যা দেয়া হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত হেদায়াতের জন্য তারা শুধু একদিকে ধাবিত হয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী

মোট কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার মধ্যে নবুওয়াতের পূর্ণতা এবং নবীদের সমাপ্তি বিদ্যমান। অর্থাৎ তাকে যদি দেখা হয়, তবে তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ আর তার সহচর বৃন্দকে দেখলে তার সমাপ্তি বুঝা যায়। এটিই নবুওয়াতের অর্থ। সুতরাং তার নবুওয়াত সত্য এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার সত্য রাসূল।

আর যখন তার নবুওয়াত সত্য এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার সত্য রাসূল। সুতরাং তার উপর যে সকল ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়েছে সবগুলো সত্য। আর তিনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য এবং পালনীয়। তার সম্পর্কে কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, মুহাম্মদ তোমাদের কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। এ ছাড়া অসংখ্য হাদীস দ্বারাও খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি প্রমাণিত। সুতরাং খতমে নবুওয়াত ইসলামের এমন একটি আক্বীদা যা ধর্মের অবশ্যকীয় বিষয়াদীর অর্ন্তভুক্ত। একে অস্বীকার করা অর্থ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করা। আর যারা খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করে এবং এ সম্পর্কে বাজে কথা বলে তারা উভয়েই কাফের।

তাইতো خاتم النبين শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এবং নবীজী তার হাদীসে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার পর আর কোন নবী আসবেনা। এটা এজন্য ঘোষণা করা হয়েছে যেন মানুষ জানতে পারে যে, পরবর্তীতে যে কোন ব্যক্তিই এপদের দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী প্রতারক-ভন্ড। কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে আজকে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। দ্বীন যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এরপর অন্যকোন নবীর প্রয়োজন নেই। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ

তিনি সর্বশেষ নবী। তিনি পরহেজগারদের ইমাম।

প্রত্যেক নবী পরহেজগার, কিন্তু প্রত্যেক পরহেজগার নবী নয়। এতে বুঝা যায় নবী একটি বিশেষ শ্রেণীর নাম আর পরহেজগার একটি সাধারণ শ্রেণীর নাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাত্রে সকল নবীদের ইমামতী করেছেন। সুতরাং তিনি সমস্ত নবীর ইমাম। সাথে-সাথে তিনি সমস্ত পরহেজগারদের ও ইমাম। অথবা বলুন ইমাম বানানো হয় তার অনুকরণ করার জন্য, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ জন্য প্রেরণা করা হয়েছে যেন, লোকজন তার অনুকরণ করে, যেমন কোরআনে বলা হয়েছে হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত কর তবে আমার অনুকরণ কর : আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবে। আর যারা নবীজির পর নেককার বা পরহেজগার হবে। তারা তার অনুকরণের মাধ্যমেই হবে। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ

তিনি পরহেজগারদের ইমাম।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং নবীদের ইমাম, এতে বুঝা যায় তিনি রাসূল এবং নবীদের সর্দার। অসংখ্য হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, তিনি মানুষ এবং রাসূলগণের সর্দার। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ

তিনি সমস্ত রাসূলের সর্দার।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ তায়ালার খলীল (অন্তরঙ্গঁ বন্ধু)। হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ) কে যেমন খলীল বানিয়েছেন, তেমনি আমাকেও খলীল বানিয়েছেন। এ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, যারা বলে ইব্রাহীম (আঃ) কেই শুধুমাত্র খলীল আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু মাত্র হাবীব, ঐকথাটি ভুল। বরং আসল কথা হলো আল্লাহ তায়ালার অন্তরঙ্গতা তাদের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত। তবে অন্যকারো জন্যও কখনো কখনো মহব্বত প্রকাশ পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ ان الله يحب المتقين নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরহেজগারদেরকে ভাল বাসেন। অন্য একস্থানে বলেছেন, ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবা কারীদেরকে এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে মহব্বত করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া উম্মতের মধ্যে যারাই আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তারা যেহেতু তার অনুসরণ করার বরকতেই তা পেয়েছেন। তাই তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়দের মধ্যে সবার সর্দার এবং প্রিয় হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী দরকার সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَحَبِيبُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

তিনি বিশ্ব প্রতি পালকের হাবীব (অন্তরঙ্গ বন্ধু)

নবীজির পর নুবুওয়াতের যে কোন দাবীদার ভণ্ড

উপরে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর যে কেউ নবুওয়্যতের দাবী করবে সে পথ ভ্রষ্ট। সে যে ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করুক না কেন তার কোন দলীল এবং ব্যাখ্যা শোনা হবে না। কারণ সে যাই বলবে তা গোমরাহ এবং আত্মপূজার কারণে বলবে। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوًى وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلٰى عَامَّةِ الْجِنِّ، وَكَافَّةِ الْوَرٰى ـ

তাঁর নবুয়্যতের পর অন্য যে কোন নবুওয়্যতের দাবী গোমরাহী এবং আত্মপূর্জার নামান্তর। তিনি জ্বিন-মানব সকলের নিকট সমানভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে নবী আপনি বলুন। হে লোক সকল আমি তোমাদের সবার নিকট প্রেরিত হয়েছি। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আপনাকে সবার নিকট সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে, আমাকে সমস্ত সৃষ্ট জীবের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে আর আমাকে দিয়ে নবীদের পরম্পরা শেষ করা হয়েছে। শরহে আক্বীদাতুত্বাহাবীর সৌদী ছাপায় সামনের ইবারত টি বাড়ানো আছে।

بِالْحَقِّ وَالْهُدٰى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ

তিনি সত্য এবং হেদায়েতর-আলো এবং জ্যোতি নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

ষষ্ঠ পাঠ

কোরআন সম্পর্কীয় আক্বীদা-কোরআন আল্লাহর কালাম এবং তার ঐশীবাণী

আল্লাহ্ তায়ালার অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ হলো কথা বলা। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বক্তা। তবে তার কথা আমাদের কথার মত নয়। তার সত্তা যেমন অতুলনীয় তার গুণ গুলোও অতুলনীয়। কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালার কালাম, হওয়াকে বিশ্বাস করা ফরজ অস্বীকার করা কুফর। এতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তায়ালা বক্তা তবে তার কথার ধরণ বা পদ্ধতি কি? সে সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালার কালাম আর আল্লাহ তায়ালার কথা মাখলুকের কথার মত নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন কোন জিনিস তার সাদৃশ্য নয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কথাও বান্দার কথার সাদৃশ্য নয় অর্থাৎ উহা পরিমাণ এবং অবস্থা থেকে মুক্ত। কেননা পরিমান ও অবস্থা শরীরের বৈশিষ্টাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এবং তার গুণাবলী তো শারীরিক গুণাবলী থেকে পবিত্র।

এ জন্য তিনি বক্তা তো ঠিকই, কিন্তু তার কথা আমাদের কথার মত নয়। আমরা যেমন জিহবা এবং মুখ দিয়ে কথা বলি আল্লাহ তায়ালা সে রকম কথা বলেন না। তবে একথা মানতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার বাণী এবং ফরমান কাল্পনিক কোন কিছু নয়। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহ) বলেন,

وَإِنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُ بَدَا بِلَاكَيْفِيَّةٍ قَوْلًا

নিঃসন্দেহে কোরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী যা নিরাকার অবস্থায় কথা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা থেকে বের হয়েছে।

উপরোল্লেখিত কথায় লেখক منه - بدا এবং قولا বলে মোতেজালাদের কথাকে খন্ডন করেছেন। তারা বলে, কোরআন আল্লাহ তায়ালা থেকে আসেনি। বরং নিছক সম্মানের জন্য কোরআনকে, কালামুল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার কথা বলা হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালার দিকে ইঙ্গিত করে

বাইতুল্লাহ বলা হয়। তারা এও বলেন যে, কোরআন শরীফ কাল্পনিকভাবে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে পরে তিনি আপন ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَأَنْزَلَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوْا أَنَّهُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ -

আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে কোরআনকে স্বীয় নবীর উপর অবতরণ করেছেন। আর ঈমানদারগণ কোরআনের উল্লেখিত পদ্ধতির সত্যায়ন করেছেন এবং তারা বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, ইহা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার বাণী মাখলুকের কথার মত ইহা সৃষ্ট নয়।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) পূর্বে منه بدا বলে ইঙ্গিত করে ছিলেন যে, উক্ত কথার প্রকৃত বক্তা আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু কথার ঢং আমাদের জানা নেই। এরপর وأنزله বলে ইঙ্গিত করেছেন ঐ লোকদের কথা খন্ডনের দিকে যারা বলে যে, কোরআন সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধরনের কথা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। বরং আসল কথা হলো ওহী হযরত জিব্রাঈল আলাইহিচ্ছালামই নিয়ে আসতেন। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) وصدقه المؤمنون বলে একথাটি বলতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ তায়ালার কথা বলা এবং সেটিকে আবার ওহীর মাধ্যমে নবীর উপর অবতীর্ণ করা ইহা এমন একটি বিষয়, যা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত এজন্য মুসলমানগণ উহ্য স্বীকার করে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তাদের সত্যায়ণ করাটা ও বাস্তব সম্মত।

যারা কোরআন শরীফকে মানুষের কথা মনে করে তারা কাফের?

فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعِمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ

فَلَمَّا أَوْعَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر

যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ শোনে তাকে মানুষের কথা মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা এ ধরনের লোকদের তিরস্কার করেছেন এবং তাদেরকে দোষী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সাথে সাথে দোযখের ধমকও দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, سأصليه سقر অতিসত্বর আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। (মুদ্দাছছির-২৬)

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন ঐ লোকটিকে যে কোরআনকে মানুষের কথা বলে জাহান্নামের ধমক দিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারলাম এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, ইহা আল্লাহ তায়ালারই কথা মানুষের কথার সাথে এর কোন সাদৃশ্যতা নেই।

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি কোরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কথা মনে করে তাঁর কুফরীর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের কথা আল্লাহ তায়ালার কথার সাথে কখনো মিলতে পারেনা। কারণ কোরআন শরীফ বাগ্মীতা এবং সাহিত্যিকতার এমন চরম শিখরে অবস্থান করছে যে, এ ধরনের কথা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোরআন মজীদ একটি মুজেযা পূর্ণ কিতাব এ জন্যে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আরবের কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন ভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে যদি পার তবে এ ধরনের দশটি সূরা অথবা একটি সূরা এনে দেখাও। কিন্তু তারা এবং অন্যরা উদাহরণ পেশ করতে পারেনি কিয়ামত পর্যন্ত তারা অক্ষমই থাকবে।

তার গুণাবলীকে মানুষের গুণাবলীর সাথে তুলনা করা কুফরী?

কোরআন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তা বলেছেন। বলার ধরণ আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। তবে আমরা এতটুকু জানি যে, তার কথা আমাদের কারো কথার সাথে মিলেনা তার গুণাবলী মাখলুকের গুণাবলীর মত নয়। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

مَنْ اَبْصَرَ هٰذَا فَقَدْ اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ اِنْزَجَرَ وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ بِمَعْنٰى مِنْ مَعَانِى الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে মানুষের কোন গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি একথাটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছে। সে উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং কাফেরদের ন্যায় কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে।

যে ব্যক্তি তা উপরে যে সকল গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। অস্বীকার করে বা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীকে অন্য কারো গুণাবলীর সাথে তুলনা করে তার ব্যাপারে উপরোক্ত ধমক এসেছে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখবে সে মুক্তি পাবে এবং সে উপদেশ গ্রহণ করবে। কাফেরদের মত কথা বলা থেকে বিরত থাকতে পারবে। সাথে-সাথে একথাও জানতে পারবে যে, আল্লাহ তায়ালার গুণ মানবীয় গুণাবলীর মত নয়। এ কথাটি লেখক বলেন,

وَعَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بِصِفَاتِهٖ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

আর সে জানতে পারল যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষের মত নয়।
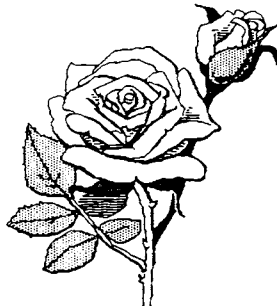
সপ্তম পাঠ

আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্পর্কে ছহীহ আকীদা

আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের বিষয়টি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। এ বিষয়টি নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং অন্যান্যদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে সাধারণভাবে স্বীকার করে। অর্থাৎ দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে উভয় স্থানে তার দর্শনকে সম্ভব মনে করে। কিন্তু দুনিয়াতে মানব চক্ষু যেহেতু আল্লাহর দর্শন সহ্য করতে অক্ষম, তাই সমস্ত উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, দুনিয়ায় থাকাবস্থায় কেউ আল্লাহকে দেখতে পারবে না। তবে মেরাজের রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন-কিনা এ ব্যাপারে সাহাবা এবং তাবেঈনদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি দল দর্শন লাভের পক্ষে বলেন আর অন্য দল তা অস্বীকার করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের এক বর্ণনায় সচক্ষে দেখার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুহাদ্দেস গণ এই বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন। যাই হোক অধিকাংশ গবেষক দর্শন না হওয়ার কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমানদারগণ আখেরাতে আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করবেন। জান্নাতে তো দর্শন লাভ হবেই আর বোখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে কেয়ামতের মাঠেও আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পাবে। বাকি কথা হল কেয়ামতের মাঠে কারা কারা দর্শন লাভ করবে.

এ সম্পর্ক তিনটি মত রয়েছে (১) শুধু ঈমানদারগণ, (২) কেয়ামতের মাঠের সমস্ত লোক চাই মুমিন হোক বা কাফের। এরপর কাফেররা আর দেখবেনা. (৩) মুমিনদের সাথে শুধু মুনাফিকরাই দেখতে পাবে কাফেররা দেখবেনা।

মোট কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে। কিন্তু জাহমিয়া.মু'তাজেলা-খাওয়ারেজ-ইমামিয়া প্রমুখ জামাত একথাটি অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের কথা বাতিল এবং কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থি।

তারা বলে দুনিয়া এবং আখেরাতে কোথাও আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ কোন জিনিস দেখার জন্য কয়েকটি শর্তের প্রয়োজন রয়েছে। (১) দর্শকের মধ্যে দর্শনের শক্তি থাকতে হবে, (২) দৃশ্যমান বস্তুটি আলোর মধ্যে থাকতে হবে, (৩) সামনে থাকতে হবে। (৪) একেবারে কাছে ও থাকতে পারবেনা, আবার একে বারে দূরেও থাকতে পারবেনা। কারণ অত্যাধিক দূরে হলেও দেখা অসম্ভব অত্যাধিক কাছে হলেও দেখা অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো স্থান-কাল, দিক ইত্যাদি থেকে পবিত্র অতএব তার দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়।

এ কথার উত্তরে আমরা বলি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- দর্শন লাভ হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বলেছেন দর্শন হবে। তবে কেন? কিভাবে? এ সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই। মুসলমানদের দায়িত্ব হলো। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন কথা বলে দিলে তা সন্দেহে মুক্ত হয়ে বিশ্বাস করা। তার ধরন অবস্থা ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ তায়ালার উপর ছেড়ে দেয়া। কোরআন এবং হাদীসের মূল পাঠ সমূহের উল্টোসিধে ব্যাখ্যা করে ঈমান হারানোর চেষ্টা না করা।

আল্লাহর দর্শন কি সত্য?

দর্শনের বিষয়টি যেহেতু কোরআন-হাদীসা দ্বারা প্রমাণিত, তাই তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তার পরও সংক্ষেপে একথা বলা যেতে পারে যে, কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দর্শনের আবেদন করেছিলেন। যদি আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব না হতো, তবে এত বড় একজন নবী এ ধরনের প্রশ্ন করতেন না। তার প্রশ্ন করাটা একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব। তাছাড়া হযরত মুসা (আঃ)-এর কথার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি যে, আমাকে দেখা যায়না, বরং বলেছেন তুমি দেখতে পারবেনা। এরপর আল্লাহ তায়ালা দেখাকে পাহাড়ের স্থিতিশীলতার সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। পাহাড়ের স্থিতিশীলতা একটি সম্ভব পর জিনিস। সাধারণত যে জিনিসটিকে কোন সম্ভবপর বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। উক্ত জিনিসটি ও সম্ভবপর হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব। যদিও মানুষের দুর্বলতা বশতঃ তা দুনিয়াতে প্রকাশ

পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আখেরাতে তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং অবস্থা ছাড়া জান্নাতবাসীদের জন্য যে দর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে তা সত্য যেমন কোরআনে বলা হয়েছে। সেদিন অনেক তরতাজা চেহেরা স্বীয়প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

এরপর ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَا اللهُ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ

উল্লেখিত আয়তের ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ তায়ালা জানা অনুসারে হবে। আর এ সম্পর্কে যে সব খবর এসেছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এভাবেই গ্রহণ করতে হবে যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। আর সেগুলোর অর্থ তাই হবে যা তিনি ইচ্ছা করেছেন।

উক্ত কথাগুলো বলে লেখক একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এবং মর্ম আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্পর্কে যে সকল হাদীস উল্লেখ হয়েছে সবগুলো সত্য। বাকি তার মর্ম যার হাদীস তিনিই ভাল জানেন, আমরা সেগুলোর কোন ব্যাখ্যা করবোনা। তবে আমরা শুধু এতটুকুই বলবো যে, আল্লাহ তায়ালার দর্শনের বিষয়টি কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) একটু স্পষ্ট করে বলেন,

لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا

আমরা মনমত ব্যাখ্যা করে তার মধ্যে নাক গলাবোনা এবং নিজ ইচ্ছায় কল্পনা করবোনা।

অর্থাৎ আমরা মুতেজেলাদের পথ ধরে চলবোনা। তারা তো নিজেদের ইচ্ছামত কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করে। যা প্রকৃতপক্ষে কোরআন এবং হাদীসের বিকৃতি সাধন। এরপর ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন.

فَإِنَّهُ مَاسَلِمَ فِي دِيْنِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّعِلْمَ مَااشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ

কেননা নিজের ধর্মের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে একমাত্র ঐ ব্যক্তিই রক্ষা পায়, যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করে। আর যে বিষয় সম্পর্কে খটকা লাগে উহাকে তার জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ ধর্মের নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূলের ফরমানের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া, কোন ধরনের উচ্চ বাচ্য ছাড়াই তা স্বীকার করে নেয়া। আর আজানা বিষয়গুলোকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সোপর্দ করা। কোরআন এবং হাদীসের মূল পাঠ গুলোর ব্যাপারে সন্দেহ না করা এবং সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের ধর্মকে ধ্বংস না করা।

আত্মসমর্পন এবং আনুগত্য ইসলামের মূল কথা

ইসলামের দাবী হলো, কোন ধরনের আপত্তি ছাড়াই শরয়ী বিধি-বিধানগুলো মেনে নেয়া এবং যে সব জিনিসের ইলম আমাদের কাছে নেই সেগুলোর পেছনে না পড়া। কারণ যেই সব জিনিস জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সেইগুলোর পিছনে পড়ার অর্থ খাঁটি তাওহীদ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকা। আর এ ধরনের লোক ঈমান এবং কুফর সত্য এবং মিথ্যা-স্বীকার এবং অস্বীকারের মাঝে দোদল্যতায় থাকে। না তাকে সত্যবাদী মুমিন বলা যায় না মিথ্যুক কাফের বলা যায়। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) একথাটি বলেন,

وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ

ইসলাম আত্মসমর্পন এবং আনুগত্য ছাড়া স্থির থাকতে পারেনা।

ইসলামের উপর অটল এবং অবিচল থাকার জন্য কোরআন এবং হাদীসের মূল পাঠগুলোর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করা এবং উক্ত মূল পাঠ

গুলো থেকে যে কথা গুলি বের হয় তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া আবশ্যক। নিজের যুক্তি এবং চিন্তা-ধারা দিয়ে তার সাথে মোকাবেলা করা ঠিক নয়। ইমাম বোখারী (রহঃ) ইমাম যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তায়ালার কাজ হলো রাসূল পাঠানো, আর রাসূলের কাজ হলো আল্লাহ তায়ালার হুকুম গুলো প্রচার করা। আর আমাদের কর্তব্য হলো তা মানা। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَاحُجِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِى الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْأِيْمَانِ۔

যে ব্যক্তি এমন কোন জিনিসের জ্ঞান অন্বেষণ করে যা তার থেকে রুখে রাখা হয়েছে। আর তাঁর বিবেক আনুগত্যে তুষ্ট না হয়। তবে তার এ অভিলাষ তাকে খাঁটি তাওহীদ, নিখুঁত আধ্যাত্মিকতা এবং সঠিক ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সামনে ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ وَالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُوَسْوِسًا تَائِهًا شَاكًّا لَامُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلَاجَاحِدًا مُكَذِّبًا ۔

উক্ত ব্যক্তি কুফর এবং ঈমান, সত্য এবং মিথ্যা, স্বীকার এবং অস্বীকারের মাঝে ঝুলে থাকবে। তাঁর অবস্থা হবে সন্দেহ প্রবণ এবং দ্বিধান্বিত। না সত্যবাদী মুমিন হবে না মিথ্যুবাদী কাফের হবে।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন হাদীসের মূল পাঠ ছেড়ে অনর্থক ব্যাখ্যা এবং মতামতের পেছনে পড়বে সে অস্থির হয়ে থাকবে। পেরেশানি -গোমরাহী এবং সন্দেহের আবর্তে ফেঁসে যাবে। আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে, কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে বিমুখ হয়ে দার্শনিক চিন্তা এবং দর্শন গবেষণার পেছনে পড়বে, তার অবস্থা এমন হবে যে, সন্দেহ এবং কল্পনা তাকে ধরাশায়ী করে ছাড়বে। আর এ গবেষণাটি তাকে এমন স্থানে নিয়ে পৌঁছাবে যে, তার ঈমান এবং কুফরের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে।

তাকে সত্যবাদী মুমিনও বলা যাবেনা। কারণ বিভিন্ন সন্দেহ এবং কল্পনা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। আবার মিথ্যুক এবং কাফেরও বলা যাবেনা। কেননা সে আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করে।

পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার দর্শন কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কেউ এর অপব্যখ্যা করলে তা দুভাবে করতে পারে।

প্রথমত ঃ ধরুণ, কেউ আল্লাহর দর্শনকে মানল কিন্তু তাকে মাখলুকের দর্শনের সাথে তুলনা করল।

দ্বিতীয়ত ঃ কেউ দর্শনকে সরাসরি অস্বীকার করে দিল উভয় পন্থাই ভূল। কারণ প্রথমাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে তুলনা করা হচ্ছে, দ্বিতীয় অবস্থায় বেকার বলা হচ্ছে।

সুতরাং নির্ভুল পন্থা হল আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভকে মানা, তুলনা এবং বেকারত্বের উক্তি থেকে বেঁচে থাকা। আর ইহা অপব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই সম্ভব। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَا يَصِحُّ الْإِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْتَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ إِذْكَانَ تَاوِيْلُ الرُّؤْيَةِ وَتَاوِيْلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوْبِيَّةِ لَايَصِحُّ فَلَايَصِحُّ الْإِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ إِلَّابِتَرْكِ التَّاوِيْلِ وَلُزُوْمِ التَّسْلِيْمِ وَعَلَيْهِ دِيْنُ الْمُرْسَلِيْنَ

জান্নাতবাসীদের দর্শন লাভের উপর ঐ ব্যক্তির ঈমান আনা ঠিক হবেনা। যে ব্যক্তি দর্শনকে কল্পনা মনে করে বা উহাকে নিজের বিবেক অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার দর্শনের ব্যাখ্যা দেয়া এবং তার অন্য যে কোন গুণের ব্যাখ্যা দেয়া দুরস্ত নয়, তাই আল্লাহ তায়ালার দর্শনের উপর ঈমান আনাটাও দুরস্ত হবেনা। তবে অপব্যাখ্যা ছেড়ে দিলে এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিলে তা দুরস্ত হবে ইহাই রাসূলগণের ধর্ম।

আল্লাহর গুণাবলী অস্বিকার করার পরিণতি

এখান থেকে লেখক মুতেজলা পন্থি যারা আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে অস্বীকার করে তাদের এবং ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ তায়ালাকে

মাখলুক এবং তার গুণাবলীর সাথে তুলনা করে তাদের রদ করছেন ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقِّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيْهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيْهَ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার এবং তুলনা করা থেকে বেঁচে থাকতে পারেনি সে পদস্খলনের সম্মুখিন হয়েছে। সে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা প্রমাণ করতে পারেনি।

কেননা অস্বীকার এবং তুলনা উভয়টি এমন রোগ যা অদৃশ্যকে দৃশ্যের উপর অনুমান করার কারণে সৃষ্টি হয়। অথচ অদৃশ্যকে দৃশ্যের উপর অনুমান করা দুরস্ত নয়।

বাহ্যত একথাটি বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার দর্শন তো লাভ হবে। কিন্তু মাখলুকের দর্শনের মত নয়। সুতরাং দর্শনকে যদি অস্বীকার করা হয় বা দর্শনকে মেনে অন্যের সাথে তুলনা করা হয় উভয়টি ভুল হবে এরকম হওয়ার কারণ কি? এর কারণ হলো আল্লাহ তায়ালার সত্তা একক আর তাঁর গুণাবলীও একক। অর্থাৎ তিনি সত্তা হিসেবে ও একক গুণাবলী হিসেবে ও একক, গুণের দিক থেকে কেউ তার সমান নয়। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوْفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَةِ مَنْعُوْتٌ بِنُعُوْتِ الْفَرْدَانِيَةِ لَيْسَ فِيْ مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْبَرِيَّةِ ـ

কেননা আমাদের প্রভু অনন্য গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত, মাখলুকের মধ্যে কেউ তার গুণের অধিকারী নন।

অষ্টম পাঠ

আল্লাহ তায়ালা সীমারেখা ও অঙ্গ প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে যখন একথা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা অদ্বিতীয় এবং তার গুণাবলী অতুলনীয়। সুতরাং প্রত্যেক সৃষ্ট জীবকে যেমন ছয়টি দিক বেষ্টন করে থাকে, তেমনি আল্লাহ তায়ালাকে বেষ্টন করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিক সমূহের স্রষ্টা তাই সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টাকে বেষ্টন করা কি করে সম্ভব। তাছাড়া মাখলুক অসহায় হওয়ার কারণে কাজ করার জন্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালারও যদি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তবে সৃষ্ট এবং স্রষ্টার মাঝে কোন পার্থক্য থাকবেনা। উপরন্ত এটি তার স্বয়ং সম্পূর্ণতার পরিপন্থি। সুতরাং বুঝা গেল যন্ত্রপাতি বা আসবাব পত্রের দিকে তিনি মুখাপেক্ষী নন। তার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নেই। কারণ এগুলোর জন্য গঠন প্রক্রিয়া আবশ্যক আর গঠনের জন্য নতুন সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। অথচ আল্লাহ তায়ালার সত্তা অনন্ত অনাদি।

সুতরাং যে সকল মূলপাঠে তার জন্য চেহেরা হাত ইত্যাদী অর্থবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো আমরা স্বীকার তো করি তবে সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন বলি। আমরা এতটুকু নিশ্চয়ই জানি যে, তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এটা মুখাপেক্ষীহীনতার পরিপন্থি তাই আমরা উল্লেখিত গুণগুলো মানি কিন্তু তাঁর ধরনের বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করে থাকি। আল্লাহ তায়ালার কোন কিনারা এবং শেষ নেই। কেননা এটি সীমিত বস্তু এবং শরীর সমূহের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা তো কোন সীমিত বস্তু নন শরীর ধারীও নন, কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধও নন, কোন জায়গায় বেষ্টিতও নন। এছাড়া আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সত্তাগত উপার্জিত নয়। কারণ উপার্জিত জ্ঞানের একটি সীমা রেখা থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের তা কোন সীমা রেখা নেই। একথাটি ইমাম তাহবী (রহঃ) বলেন,

تَعَالَى عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ
وَالْأَدَوَاتِ لَاتَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَاتِ

আল্লাহ তায়ালা সীমা ও প্রান্ত থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং যন্ত্রপাতি থেকে পবিত্র। মাখলুকদের মত ছয়টি দিক তাকে ঘিরে রাখেনি এবং ঘিরে রাখা সম্ভবও নয়।

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার সত্তা ইলমের গুণে গুণান্বিত। তিনি কোন কিছু দ্বারা বেষ্টিত নন। দুনিয়াতে তাকে চোখে দেখা যায় না। তার কোন সীমা রেখা তথা ইয়ত্তা নেই। আখেরাতে তাকে সচক্ষে দেখা যাবে। তিনি স্বীয় রাজত্ব এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর। মাখলুক তার স্বরূপ উন্মোচন করতে অক্ষম। তার নিদর্শন সমূহ তাঁর খবর দিয়ে থাকে। মানুষের অন্তর ঠিকই তাকে অনুভব করে কিন্তু চক্ষু থাকে দেখতে পায় না।

মেরাজ ও ইসরার মর্মকথা

আক্বীদার বিষয়াবলীতে মেরাজের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। কোরআনে তার সংক্ষীপ্ত বর্ণনা রয়েছে, আর হাদীসে তাঁর বিশদ বিবরণ আছে– মেশকাত শরীফের ৫২৬ পৃষ্ঠায়, আর বোখারী শরীফের ৫৪৮ পৃষ্ঠায় মেরাজের রেওয়ায়েত সমূহ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দস পর্যন্ত যাওয়াকে ইসরা বলা হয়। একথার প্রমাণ কোরআনের অকাট্য মূল পাঠে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

ঐ সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করেছি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন।

জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত মেরাজের কথাটি হাদীসে মাশহুরা (প্রসিদ্ধ হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত। এরপর আসমান থেকে জান্নাত অথবা আরশ কুরসী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণের বিষয়টি একক বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসরাকে অস্বীকার করবে সে অকাট্য মূল পাঠকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে। আর যে শুধু মেরাজকে অস্বীকার করবে সে বেদাআতী এবং পথ ভ্রষ্ট হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কেননা সে প্রসিদ্ধ হাদীস সমূহকে অস্বীকার করলো।

এ ছাড়া একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজ শুধু আত্মিক বা ঘুমন্ত অবস্থায় হয়নি। বরং জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে হয়েছে। এ কারণেই তো কাফেররা এ বিয়টিকে কঠোর ভাবে অস্বীকার করেছে। অন্যথায় এটি যদি শুধু একটি স্বপ্ন হতো অথবা আত্মিকভাবে হতো। তবে মক্কার কাফেররা এ বিষয়টি এত কঠোর ভাবে অস্বীকার করতনা। তাছাড়া মেরাজ সশরীরে হওয়ার আরো কয়েকটি প্রমাণ আছে। যেমন ঃ

(১) আল্লাহ তায়ালা মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে سبحان শব্দ ব্যবহার করেছেন, এ শব্দটি সাধারণত যে কোন আশ্চর্যজনক বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, মেরাজ সশরীরেই হয়েছে। অন্যথায় বিষ্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। (২) আয়াতে عبد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এদিকেই ইঙ্গিত দেয় যে, মেরাজ সশরিরে হয়েছে। কারণ শুধু মাত্র আত্মাকে عبد বলা হয় না বরং আত্মা ও শরীরের সমষ্টিকে عبد বলা হয়। মেরাজের কথা উল্লেখ করে ইমাম তাহবী (রহঃ) বলেন,

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ قَدْ أُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِى الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلٰى حَيْثُ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى وَأَكْرَمَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى بِمَا شَاءَ وَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهِ مَاأَوْحٰى

মেরাজ সত্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের বেলায় মসজিদে আকসায় ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং জাগ্রত অবস্থায় তাকে সশরীরে আসমানে উঠানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা যেখানে চেয়েছেন সেখানে নিয়ে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে যে জিনিস দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছেন, সম্মান করেছেন এবং যা ওহী করার ইচ্ছা করেছেন ওহী করেছেন।

ব্যখ্যা ঃ উক্ত মেরাজে প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ) এর সাথে, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে চতুর্থ আসমানে

হযরত ইদ্রীছ (আঃ) এর সাথে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে, সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে নবীজির সাক্ষাত হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ লেখক তার পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী খুব সতর্কতার সাথে মেরাজের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আসমান থেকে সামনে কতটুকু গিয়েছেন এ নিয়ে যেহেতু মতানৈক্য রয়েছে এবং এ সম্পর্কে যতগুলো হাদীস আছে সবগুলো একক বর্ণনাকারী সর্বস্ব, এ তাই লেখক এটি নির্দিষ্ট করে বলেননি। বরং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

হাউজে কাউসর আল্লাহর একটি বড় দান

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো হাউযে কাউসার। কাউসারের কথা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কাউসার জান্নাতের একটি নহর আর হাউযে কাউসর ঐ নহরের একটি শাখা। মানুষ যখন কবর থেকে উঠবে তখন পিপাসায় কাতর হয়ে থাকবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদেরকে উক্ত হাউযের পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করবেন। হাউযে কাউসারের গুণাবলী হাদীসে উল্লেখ আছে। ইমাম ত্বাহাবীর ভাষায় শুনুন।

وَالْحَوْضُ الَّذِىْ أَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ غِيَاثًا لِأُمَّتِهٖ حَقٌّ

উম্মতের পরিতৃপ্তির জন্য যে হাউজটি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মানিত করেছেন, তা সত্য।

নবম পাঠ

শাফায়াত সম্পর্কে ছহীহ আকীদা

সুপারিশ কত প্রকার এবং তা কার জন্য? ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এ সুপারিশটি নবী, নেককার ব্যক্তি কোরআনের হাফেজ -আলেম-শহীদ প্রমুখদের জন্য সাব্যস্ত। তবে সব চেয়ে বড় সুপারিশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। যখন সমস্ত নবী আপন চিন্তায় মগ্ন থাকবেন কেউ সুপারিশ করার সাহস পাবেন না, তখন একমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। এটি সুপারিশের প্রথম প্রকার একে শাফায়াতে কুবরা বলা হয়। তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের সুপারিশ ঐ সকল লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হবে যাদের নেকী এবং বদী সমান হয়ে যাবে। আর কিছু লোক এমন হবে যাদের সম্পর্কে জাহান্নামে প্রবেশের নির্দেশ দিয়ে দেয়া হবে। ওদের ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করবেন, যাতে জাহান্নামে প্রবেশ করতে না হয়।

চতুর্থ প্রকারের সুপারিশ হল, তিনি জান্নাত বাসীদের উন্নত মর্যাদার জন্য সুপারিশ করবেন। এ সুপারিশটি মু'তেজালারও মানেন। পঞ্চম প্রকারের সুপারিশ হলো, তার সুপারিশে কিছু মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ষষ্ঠ প্রকারের সুপারিশ হলো, তার সুপারিশে আযাবের উপযুক্ত ব্যক্তিদের আযাব লঘু করে দেয়া হবে। যেমন ওনার চাচা আবু তালেবের আযাব এ ধরণের সুপারিশে হাল্কা করে দেয়া হবে।

সপ্তম প্রকারের সুপারিশ হলো, ওনার সুপারিশে জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবেন। অষ্টম প্রকারের সুপারিশ হলো, যে সকল মুমিনকে কবীরা গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। মু'তেজলা এবং খাওয়ারেজরা এ সুপারিশটি অস্বীকার করে। অথচ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা কবীরা গোনাহকারীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ করাটি প্রমাণিত।

এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِيْ ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জন্য যে শাফায়াত সংরক্ষণ করে রেখেছেন তা সত্য। যেমন নাকি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে।

মেশকাত শরীফের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিকট একজন আগন্তুক আসে এবং সে আমাকে আমার উম্মত থেকে অর্ধেক লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফায়াত করা এ দুইয়ের মাঝে এখতিয়ার দেয়, তখন আমি সুপারিশ করাকে গ্রহণ করি। আর এ শাফায়াত ঐ সকল লোকের জন্য হবে যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না। উক্ত হাদীসটি তিরমিযী এবং ইবনে মা'জায় বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোক সুপারিশ করতে পারবে, (১) নবী গণ (২) আলেম গণ (৩) শহীদ গণ। এ হাদীসটিও ইবনে মা'জায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার নেয়া অঙ্গীকারটি সত্য

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) এর পিঠ থেকে তার সকল সন্তানকে বের করে যে খোদায়ীর অঙ্গীকারটি নিয়েছেন একে মীসাক বা অঙ্গীকার বলা হয়। কোরআন এবং হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে। এ জন্য আমরা একে সত্য মনে করি।

ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন

وَالْمِيثَاقُ الَّذِىْ أَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اٰدَمَ وَذُرِّيَّتِهٖ حَقٌّ

যে অঙ্গীকারটি আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) এবং তার সন্তানদের থেকে নিয়েছেন তা সত্য।

ব্যাখ্যা ঃ সকল সৎ আক্বীদা এবং আসমানী ধর্মের মূল ভিত্তি হলো, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং প্রভুত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ধর্মের পুরো ইমারতটি এই ভিত্তি প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশ্বাস সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের ক্ষেত্রে বিবেক এবং চিন্তার দিক নির্দেশনা-নবীগণের হেদায়েত কোন কাজে আসবে না। যদি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করা হয়, তবে দেখা যাবে আসমানী মাযহাবের সকল মৌলিক অমৌলিক বিষয়াবলী আল্লাহ তায়ালার সার্বিক প্রভূত্বের উক্ত বিশ্বাসের উপর গিয়েই শেষ হয়। বরং তার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সুষ্ঠু বিবেক

-ওহী এবং খোদায়ী অন্তঃনিক্ষিপ্ত বার্তা ঐ সংক্ষিপ্ত বিবরণের ব্যাখ্যা মাত্র। তবে আমাদের স্মরণ নেই যে, ঐ মৌলিক বিশ্বাসের শিক্ষা কবে কোথায় এবং কোন পরিবেশে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো, ধরুন এক জন বক্তা এতটুকু বলতে পারে যে, জীবনের শুরুতে তাকে কেউ নিশ্চয়ই কথা বলা শিখিয়েছেন। যদিও সর্বপ্রথম শব্দটি কে শিখিয়েছেন এবং শব্দটি কি ছিল তা মনে নেই। যা হোক উক্ত অঙ্গীকারটি সত্য। তার উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। কোরআন এবং হাদীসে এর প্রমাণ ও আছে। মুসলমানদের জন্য তা মানা জরুরী।

বান্দার শেষ পরিণতি এবং দোযখী-জান্নাতীদের সংখ্যা আল্লাহর জানা

পূর্বে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাত। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন। তার জ্ঞান অনাদি অনন্ত। তিনি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব থেকেই জানেন যে, কে কে জান্নাতে যাবে, আর কে কে দোযখে যাবে। আবার আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও নেই। অর্থাৎ নির্দিষ্ট হারে বাড়বে বা কমবে তা ও হতে পারে না। তা ছাড়া সৃষ্টির শুরু থেকে এ কথাও তিনি জানেন যে, কে কোন ধরণের আমল করবে, আর তার পরিণতি কি হবে। এখন মানুষ যে ধরণের আমল করুক না কেন তা আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান অনুযায়ীই করবে।

এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً لَا يَزْدَادُ فِىْ ذٰلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَكَذَالِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيْمَا عَلِمَ مِنْهُمْ اَنْ يَفْعَلُوْهُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَالشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ ـ

অনুবাদ ঃ যারা জান্নাতে যাবে এবং যারা জাহান্নামে যাবে তাদের সংখ্যা সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা জানেন। এ সংখ্যায় কোন ধরণের বেশ-কম হবে না। অনুরূপ ভাবে বান্দাগণ এমন সব কাজ করবেন

যা তাঁর ইলমে রয়েছে। আর যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ করে দেয়া হয় ক্রিয়া কর্মের বিচার পরিণতি হিসেবে হয়ে থাকে। ভাগ্যবান সেই যে আল্লাহ তায়ালার ফায়সলায় ভাগ্যবান। আর হতভাগা সেই যে, আল্লাহ তায়ালার ফায়সলায় ভাগ্যহত।

জ্ঞাতব্য ঃ এখানে লেখক যা কিছু বলেছেন, তন্মধ্যে কিছু তো হুবহু হাদীসের শব্দ আর কিছু হাদীসের অর্থের বর্ণনা। তবে এ কথাটি সর্ব স্বীকৃত যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা সৃষ্টির শুরু থেকে হয়ে আছে, কে জান্নাতী এবং কে দোযখী। একথা শুনে সাহাবা গণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল তাহলে আমরা তাক্‌দীরের উপর ভরসা করে বসে থাকি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমল কর এতে তোমাদের মধ্যে যে কেউ ধীরে ধীরে ঐ জায়গায় পৌছে যাবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ- সে যদি ভাগ্যবান হয় তবে ভাল কাজ করার তৌফিক হবে, আর ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি হতভাগা হয় তবে ঐ ধরণেরই কাজ তার থেকে প্রকাশ পাবে, আর উক্ত অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হাদীসে বলা হয়েছে, إنما الأعمال بالخواتيم

অর্থাৎ, আমলের মূল্যায়ণ শেষ পরিণতি হিসেবে হয়ে থাকে।

যদি কেউ পুরো জীবন কুফরী অবস্থায় কাটায় আর জীবনের শেষ মুহুর্তে কয়েকদিন মুসলমান থাকে এবং আনুগত্য স্বীকার করে, তবে পূর্বের অবস্থা কি ছিল তা দেখা হবে না। আর যদি সারা জীবন মুসলমান থাকে কিন্তু শেষ বয়সে মুরতাদ হয়ে যায়, এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তবে ঐ অবস্থারই মূল্যায়ণ করা হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ মানুষ আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধের জিম্মাদার, ভাগ্য লিপিতে কি লেখা আছে তা জানা মানুষের দায়িত্ব নয় এবং মানুষ চাইলেও জানতে পারবে না। তাকে তো আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধবস্তু বর্জন করতে বলা হয়েছে। তাকদীরের বিষয়টি তো তার থেকে গোপন। আল্লাহ তায়ালা কি লিখেছেন তা তিনিই ভাল জানেন আমরা জানিনা। জানা বিষয় অস্বীকার করা এবং গোপন বিষয় অন্বেষণ করা উভয়টি কুফর। মোট কথা তাই হবে যা আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা করে রেখেছেন। তার পরও যেহেতু মানুষকে ইচ্ছা এবং শক্তি দেয়া হয়েছে তাই তাকে শরয়ী বিধি-বিধানের জিম্মাদার বানানো হয়েছে।

দশম পাঠ

তাকদীর সম্পকীয় ছহীহ আকীদা

তাকদীর কি?

পূর্বে তাক্‌দীর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বিষয়টি গ্রন্থকার খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। আসল কথা হলো তাকদীর আল্লাহ তায়ালার একটি রহস্য। যে রহস্যটি কোন নিকটতম ফেরেস্তা বা কোন নবী রাসূলও জানতে পারে না। তাকদীর যখন একটি রহস্য সুতরাং তাতে নাক গলানো আশংকাজনক। তা ছাড়া উক্ত রহস্যটি অনুসন্ধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এর সুক্ষতা বুদ্ধির সুক্ষতার চেয়েও গভীর। উপরন্ত বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা নিজে গোপন রেখেছেন, মাখলুককে তিনি তার জ্ঞান দান করেননি এবং তার অনুসন্ধান করার অনুমতিও দেননি। অতএব কেউ যদি বিষয়টি অনুসন্ধান করে সে বঞ্চনা এবং গোমরাহীর শিকার হতে বাধ্য তাকদীরের বিষয়টি যদিও বান্দাদের নিকট রহস্যাবৃত কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তা স্পষ্ট। এর কারণ হল, যে কোন উদ্দেশ্যময় বস্তু গঠন করার আগে সে সম্পর্কে কর্তার ধারণা থাকা আবশ্যক। নতুবা কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়না। যেমন- ঘর যদি নির্মাণ করতে হয় তবে প্রথমে তার নকশা করতে হয়। খানা পাকাতে হলে প্রথমে তার পরিমাণ ঠিক করতে হয়। কাপড় সিলাই করতে হলে প্রাথমে তা কাটতে হয়।

সুতরাং প্রয়োজন হল, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন বা করবেন তার পরিমাণ এবং নমুনা তাঁর নিকট থাকা। নতুবা বলতে হবে যে, তার কার্যক্রম পাথর এবং গাছের নড়া চড়ার মতই অর্থাৎ অগোছালো।

আল্লাহ তায়ালা যা কিছু করেছেন তা তিনিই ভাল জানেন। আর কেন করেছেন, তার হেকমত এবং রহস্য ওবা কি তাও তিনি ভাল জানেন। এ ব্যাপারে অন্য কারো জিজ্ঞাসাবাদের কোন অধিকার নেই। বরং তিনিই সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আপত্তি করতঃ আল্লাহ তায়ালার হুকুম সম্পর্কে একথা বলবে যে, এটি কেন করল এটি কেন করল না? সে কোরআনের হুকুমকে অমান্য করল। আর যে কোরআনের হুকুমকে অমান্য করে সে কাফের। যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাজ হলো

আনুগত্য করা আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মানা। যে সকল জিনিস অনুসন্ধান করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা। কারণ ইলম দু প্রকার, একটি হলো যা মাখলুককে দেয়া হয়েছে আর দ্বিতীয়টি হলো যা মাখলুককে দেয়া হয়নি, বরং তা গোপন রাখা হয়েছে। প্রকাশ্য ইলমকে অস্বীকার করা যেমন কুফর অপ্রকাশ্য ইলমকে অস্বীকার করাও তেমন কুফর। ঈমান মজবুত করার জন্য উপস্থিত ইলম গ্রহণ করা এবং গোপন ইলম অন্বেষণের পেছনে না পড়া আবশ্যক। সব সময় নিজের অজ্ঞতা এবং আল্লাহ তায়ালার ইলম অসীম হওয়াকে বিশ্বাস করবে।

এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِهٖ لَمْ يَطَّلِعْ عَلٰى ذٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَانَبِىٌّ مُرْسَلٌ

আল্লাহ তায়ালার মাখলুকের জন্য তাক্‌দীরের মূল হলো, উহা আল্লাহর একটি রহস্য। যে সম্পর্কে কোন নিকটবর্তী ফেরেস্তা বা কোন নবী অবগত হতে পারে না।

উপরোক্ত কথায় ঐ সকল লোকের রদ হয়ে গেল, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞানী বলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হলো "আলেমুল গায়ব" শুধু আল্লাহ তায়ালাই। তবে মাখলুকের মধ্যে সব চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবার জ্ঞান দান করা হয়েছে।

তাকদীর নিয়ে গবেষণা করা কি উচিত

وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِىْ ذٰلِكَ ذَرِيْعَةُ الْخَذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ

আর তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা বঞ্চনার কারণ দুর্ভাগ্যের সিঁড়ি এবং অবাধ্যতার মাধ্যম।

فَالْحَذَرُكُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذٰلِكَ نَظَرًا اَوفِكْرًا اَوْ وَسْوَسَةً فَاِنَّ اللّٰهَ طَوٰى عِلْمَ الْقَدْرِ عَنْ اَنَامِهٖ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهٖ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

সুতরাং তাকদীরের বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা, কল্পনা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকদীরের বিষয়টি স্বীয় বান্দাদের থেকে গোপন রেখেছেন এবং উহা অনুসন্ধান করতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি যা কিছু করেন সে সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা রাখে না। পক্ষান্তরে তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

তাকদীরের ইলম দাবী করা কুফরী

فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّحُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّحُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

সুতরাং যে ব্যক্তি, এ রকম কেন করল? এ বলে প্রশ্ন করে সে যেন কোরআনের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করল। আর যে কোরআনের হুকুমকে অমান্য করে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

কেননা দাসত্ব এবং ঈমানের ভিত্তি আনুগত্য এবং আদেশ নিষেধের হেকমত জিজ্ঞেস না করার উপর। অতএব যে আনুগত্য ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে।

فَهٰذِهٖ جُمْلَةُ مَايَحْتَاجُ اِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌقَلْبُهٗ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهِىَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِى الْخَلْقِ مَوْجُوْدٌ وَعِلْمٌ فِى الْخَلْقِ مَفْقُوْدٌ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْدِ كُفْرٌوَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُوْدِ كُفْرٌ وَلَايَصِحُّ الْإِيْمَانُ إِلَّابِقَبُوْلِ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْدِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُوْدِ

মোট কথা উপরোক্ত কথাগুলোর দিকে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই মুখাপেক্ষী যার অন্তর আলোকিত হয়ে আছে। আর উহাই জ্ঞানে পরিপক্ক লোকদের স্তর। কারণ ইলম দু প্রকার। এক প্রকারের ইলম হল যা মাখলুকের মধ্যে বিদ্যমান আর এক প্রকারের ইলম হল যা মাখলুকের মধ্যে বিদ্যমান নয়। সুতরাং প্রকাশ্য ইলমের অস্বীকার করা কুফরী আর অদৃশ্য ইলমের দাবী করাও কুফরী. তাই প্রকাশ্য ইলম এবং অপ্রকাশ্য ইলমের অনেষণ বাদ দেয়া ছাড়া ঈমান শুদ্ধ হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ লেখক ইঙ্গিত সূচক শব্দ উচ্চারণ করে উপরোক্ত আক্বীদা সমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ উল্লেখিত কথা, যেগুলোর উপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন সেগুলো এমন যে, তা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। তাই আল্লাহ তায়ালার যে সব প্রিয় বান্দার অন্তর আলোকিত থাকে তারা সে গুলো মানতে বাধ্য হয়। আর জ্ঞানের পরিপক্ক লোকদের স্বভাব হল, তারা এ ধরণের বিষয়গুলো মানতে প্রস্তুত থাকে। আর উহার বিশ্লেষণ আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করে দেয়।

প্রকাশ্য ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের ইলম। স্পষ্টত যারা তা অস্বীকার করে তারা কাফের। আর গোপন ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকদীরের ইলম। একথা স্পষ্ট যে, যারা অদৃশ্য ইলমের দাবী করে সে কাফের। সুতরাং যারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য লোকদেরকে গোপন বিষয়ের জ্ঞানী বলেন তাদের উচিত হল উপরোক্ত কথাগুলো বুঝা।

একাদশ পাঠ

লওহে মাহফুয এবং কলম সম্পর্কে ছহীহ আকীদা

কোরআন শরীফে লওহে মাহফুজ এবং কলমের বর্ণনা রয়েছে। আমরা উক্ত বস্তুদ্বয়ের উপর ঈমান রাখি। লওহে মাহফুজে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত দ্বারা মাখলুকের ভাগ্য লিপি গুলো লিখে দিয়েছেন। আর তা লিখেছেন কলম দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা কলমকে লেখার আদেশ দেয়ার পর কলম বললো হে প্রভু কি লিখব? তাকে বলা হলো কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু লিখে দাও। সুতরাং কলম এবং লওহে মাহফুজের উপর আমরা ঈমান রাখি।

লওহ কলম কি?

জ্ঞাতব্য ঃ ওলামাদের মধ্যে এ নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, না কলমকে। এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। (১) প্রথমে আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে পরে কলমকে বানানো হয়েছে। (২) প্রথমে কলম বানানো হয়েছে পরে আরশ বানানো হয়েছে। হাদীসে উভয় ধরণের বর্ণনা রয়েছে। কেউ-কেউ উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা সর্বমোট চারটি কলমের সন্ধান পাওয়া যায়,

(১) প্রথম কলম উহা যা সমস্ত সৃষ্ট জীবকে লিখেছে, অর্থাৎ যে কলমটি লওহে মাহফুজে সর্বকিছু লিখে দিয়েছ, (২) দ্বিতীয় কলম বণী আদমের আমল তাদের রুজী ও আয়ুস্কাল সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য সবগুলো লিখেছে। এ কলমটি আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩) তৃতীয় কলম যা সব ধরণের কাজ করে। যখন সন্তান মায়ের পেটে অবস্থান করে এবং তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে ফেরেস্তাগণ তার রুজী আয়ুস্কাল আমল সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য সব কিছু লিখেদেন। (৪) বান্দা যখন সাবালক হন তখন কাঁধের দুই ফেরেস্তা তার আমল গুলো লিখতে থাকেন।

যাই হোক লওহে মাহফুজ এবং কলমের উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। সাথে সাথে কলম লওহে মাহফুজে যা কিছু লিখেছেন তার উপরও আমাদের ঈমান আছে। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَاقَدْ رَقَمَ

আর আমরা লওহ কলমের উপর ঈমান রাখি এবং ঐ সকল কথার উপরও ঈমান রাখি যা কলম লিপিবদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত রদ বদল হয় না

পূর্বে একথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ অটল থাকে। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার আদেশে কলম যা কিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হবে। মাখলুকের কোন ইচ্ছা সেখানে প্রতিফলিত হবে না। উক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, যে সকল অবস্থা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় চাই শান্তি এবং আনন্দ হোক চাই দুঃখ আর দুর্দশা হোক তা কোন কৌশল অবলম্বন করে রহিত করা সম্ভব নয়। আর যা মানুষকে স্পর্শ করেনি তা কোন উপায়ে স্পর্শ হওয়ার মতও নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার তাকদীর অটল থাকে। মজবুত এবং অবিচল থাকে যা রহিত এবং পরিবর্তন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেউ তাকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করতে পারবে না। আবার কেউ তার মধ্যে রদবদলও করতে পারবে না, কারণ যা কিছুই হয় আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়। সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজেই। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ছাড়া কোন জিনিস আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইমাম ত্বাহাবী বলেন,

فَلَوِاجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيهِ إِنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَكَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ

আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস সম্পর্কে হওয়ার আদেশ লিখে দিয়েছেন, সেটি যদি সমস্ত মাখলুক এক হয়ে না করতে চায় তা সক্ষম হবে না। আর যে জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা না হওয়ার আদেশ লিখে দিয়েছেন সেটি যদি সমস্ত মাখলুক করতে চাই তাও পারবে না।

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে কলম শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ কলম লিখে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। এখন কেউ তা নড়াতে পারবে না, যা লেখা হয়েছে তাই হবে।

وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ

যা বান্দার নিকট পৌঁছেনি তা পৌঁছার ছিলনা, আর যা পৌঁছেছে তা পৌঁছার মতই ছিল।

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدَّرَ ذٰلِكَ بِمَشِيَّتِهِ تَقْدِيرًا مُبْرَمًا لَيْسَ لَهُ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا مُحَوِّلٌ وَلَا زَائِدٌ وَلَا نَاقِصٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضِهِ

বান্দার জন্য এ কথাটি জেনে রাখা আবশ্যক যে, মাখলুকের প্রতিটি সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই জানেন। অতঃপর তিনি সে গুলোকে স্বেচ্ছায় এমন তাক্দীরের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন যা অবিচল, যাকে কেউ খন্ডন করার শক্তি রাখে না। আবার কেউ স্থগিতও করতে পারে না। কেউ রহিতও করতে পারে না। কেউ রদ বদলও করতে পারে না। বেশ কমও করতে পারে না।

وَلَا يَكُونُ مُكَوَّنٌ إِلَّا بِتَكْوِينِهِ وَالتَّكْوِينُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَسَنًا

তাঁর সৃষ্টি ছাড়া কোন জিনিস অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর তার সব সৃষ্টি সুন্দরই হয়ে থাকে।

অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্টি হয় তার সৃষ্টি করার কারণেই হয়। আর তার প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু সুন্দরই হয়ে থাকে।

উপরোল্লেখিত সকল ঈমান আক্বীদা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূলনীতি এবং আল্লাহ তায়ালার একাত্ব-প্রভূত্বের স্বীকার মাত্র। সুতরাং সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক, অন্যথায় একাত্ববাদের শিকড় মজবুত হবে না। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَذٰلِكَ مِنْ عَقَائِدِالْإِيْمَانِ وَأُصُوْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِعْتِرَافِ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرُبُوْبِيَتِهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا

উপরোক্ত বিষয়গুলো ঈমান আক্বীদা এবং মারেফতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও প্রভুত্বের স্বীকৃতি। যেমন নাকি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আর তিনি সকল জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সেগুলোকে শোধিত করেছেন পরিমিত ভাবে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশ সুনির্ধারিত থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত হয় আবার সুস্থ হয়। কিছুদিন জীবিত থাকে আবার মরে যায়। হুবহু এ ধরণের অবস্থা অন্তরের ও হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্তর কখনো সুস্থ থাকে কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে। কখনো জীবিত থাকে কখনো মরে যায়। কোরআন হাদীসের মূল পাঠগুলোতে অন্তরের সুস্থতা-অসুস্থা, জীবিত থাকা মরে যাওয়া ইত্যাদি কথাগুলো উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, অন্তরের রোগ দু ধরণের– একটি হলো খায়েশের রোগ অপরটি হলো সন্দেহের রোগ। এ দুটির মধ্যে সন্দেহের রোগ সবচে জঘন্য। আবার সন্দেহের রোগের মধ্যে সবচে মারাত্মক হলো তাকদীর নিয়ে সন্দেহ করা। অনেক সময় অন্তরের রোগ এ পরিমাণ বেড়ে যায় যে, অন্তর মরে যায়। আর যেহেতু অন্তর ধারী লোকটি তার সুস্থতার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে বা জানা থাকলেও উদাসীন থাকে, ফলে সে অন্তরের অসুস্থা এবং মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনা। অন্তর মরে যাওয়ার আলামত হল, জঘন্য থেকে জঘন্য কাজ তার থেকে প্রকাশ পাওয়া সত্বেও তার মধ্যে নুন্যতম অনুভূতি সৃষ্টি না হওয়া। আবার অনেক সময় সে অন্তরের রোগ সম্পর্কে জানতে পারে যে, রোগ এত প্রকট আকার ধারণ করেছেন যে তার জন্য তিতা ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। কিন্তু রুগ্ন লোকটি উক্ত ঔষধকে ভয় করে চিকিৎসা থেকে দূরে থাকে। কারণ অন্তরের জন্য তিতা ওষধ হলো মনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা। আর এ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর।

মোটকথা যে ব্যক্তি তাকদীরের পেছনে নিজের কল্পনার ঘোড়া দৌড়ায় সে যেন তাকদীর নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করে। এটি তার অন্তর রুগ্ন হওয়ার আলামত। তা ছাড়া কল্পনা শক্তি দিয়ে গোপন বিষয়কে খোঁজ করার কারণে গোনাহগার হয়। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلّٰهِ فِى الْقَدْرِ خَصِيْمًا وَاَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيْهِ قَلْبًا سَقِيْمًا لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهٖ فِىْ فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيْمًا وَعَادَ بِمَاقَالَ فِيْهِ اَفَّاكًا اَثِيْمًا

ঐ লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যে তাক্‌দীর নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করে। যে ব্যক্তি তাকদীর নিয়ে চিন্তা করার জন্য রুগ্ন অন্তরকে লিপ্ত করেছে। নিঃসন্দেহে সে কল্পনা শক্তি দিয়ে গোপন রহস্যকে অনুসন্ধান করেছে, আর সে তাক্‌দীর সম্পর্কে যা বলেছে তার কারণে সে মিথ্যুক এবং পাপি হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাক্‌দীর আল্লাহ তায়ালার একটি গোপন রহস্য। সুতরাং কেউ যদি উহার অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে সে যেন আল্লাহ তায়ালার রহস্য জানার জন্য চেষ্টা করল, তাই তার জন্য অশুভ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

দ্বাদশ পাঠ
আল্লাহ তায়ালা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ

কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুরসী এবং আরশের কথা উল্লেখ করেছেন। আরশের কথাটি বেশী বলা হয়েছে, বিভিন্ন আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। তাই আমরা উভয়কে সত্য মনে করি এবং সেগুলোর অস্তিত্বের উপর ঈমান রাখি। কিন্তু কারো জন্যে এ রকম সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ তায়ালা কুরসী এবং আরশের উপর উপবিষ্ট হন। কারণ এটি পরনির্ভরদের কাজ। আল্লাহ তায়ালা তো স্বয়ং সম্পূর্ণ, সকল কিছু তার মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সব কিছু তার আয়ত্বে রয়েছে এবং তিনি সবার উপরে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ كَمَا بَيَّنَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَادُوْنَهُ مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدْ عَجَزَعَنِ الْاِحَاطَةِ خَلْقُهُ

আরশ এবং কুরসী সত্য, যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, তিনি আরশ ইত্যাদি থেকে মুক্ত। তিনি প্রত্যেক জিনিসকে বেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সব কিছুর উপরে। কিন্তু তার মাখলুক তাকে আয়ত্ব করতে অক্ষম।

জ্ঞাতব্য ঃ কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার কথাটি উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এ কথাটি বুঝার জন্য প্রথমে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী এবং কাজকর্ম সম্পর্কে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, কোরআন হাদীসের মূল পাঠগুলোতে আল্লাহ তায়ালার গুনাবলী বর্ণনা করার জন্য যে সকল শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ শব্দ এমনই যা মাখলুকের গুনাবলীর জন্যও ব্যবহার করা হয়। উদাহরন স্বরূপ চির জীব-সর্বশ্রোতা, দৃষ্টিমান-বক্তা ইত্যাদি গুণাবলী আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন, আবার মানুষের জন্যও এ সব গুণাবলী ব্যবহার করা হয়। কোরআন এবং হাদীসের যে সব স্থানে এ গুণাবলীগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কোন শর্ত ছাড়াই সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে প্রত্যেকের ব্যবহার বিধি ভিন্ন ভিন্ন। কোন মানুষকে শ্রোতা এবং দৃষ্টিমান বলার অর্থ হলো তার কাছে দেখার চোখ এবং শোনার কান আছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে দুটি জিনিস রয়েছে প্রথমতঃ ঐ যন্ত্র যাকে চক্ষু বলা হয়। এবং যেটি দেখার মাধ্যম বা উৎস। দ্বিতীয় তার পরিণাম এবং উদ্দেশ্য-দেখা। অর্থাৎ ঐ বিশেষ জ্ঞান যা চোখে দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষকে যখন দৃষ্টিমান বলা হয় তখন উৎস এবং পরিণাম উভয়টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ গুণটি যখন আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন উৎস এবং শারীরিক অবস্থা যা মাখলুকের বৈশিষ্টাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যার থেকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র তা উদ্দেশ্য হয় না। তবে এ বিশ্বাসটি রাখতে হবে যে, দেখার উৎস তার সত্তার মধ্যেও বিদ্যমান। আর তার ফলাফল অর্থাৎ ঐ জ্ঞান যা চোখে দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। উহা তার মধ্যে পুরোপুরি ভাবে রয়েছে। তবে দেখার উৎস কোথায় এবং দেখার ধরণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে "তার দেখা মাখলুকের দেখার মত নয়" এ ছাড়া আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

শুধু দেখা আর শোনা নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি গুণকে মনে করতে হবে যে, গুণ গুলো মূল উৎস এবং উদ্দেশ্য হিসেবে প্রমাণিত। তবে তার কোন আকৃতি বর্ণনা করা যায় না। শরীয়তও বান্দাকে এ দায়িত্ব দেয়নি যে, সে বিবেকের বাইরের জিনিসগুলো খুঁজে পেরেশান হবে। এ ভাবে আল্লাহ তায়ালা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথাটিও বুঝে নেয়া উচিত। আরশ অর্থ শাহী আসন উঁচু জায়গা। অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ অধিকাংশ তত্ত্ববিদ স্থিরতা বলেছেন। এ উক্ত অর্থ দ্বারা এ কথাই বুঝে আসে যে, শাসনের শাহী আসনকে এ ভাবে আকড়ে ধরা যদ্দারা তার কোন অংশ এবং কোণা আয়ত্তের বাইরে না থাকে। আর প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে কোন ধরণের বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়, বরং প্রত্যেকটি কাজ সুশৃংখল ভাবে সমাপ্ত হয়। দুনিয়াবী বাদশাহদের শাহী আসনের একটি মূল উৎস এবং বাহ্যিক আকৃতি থাকে। আরেকটি বাস্তবতা এবং উদ্দেশ্য থাকে তা হলো দেশময় কর্তৃত্ব-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে ও এ উদ্দেশ্যটি খুব ভাল ভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পর তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং সব ধরণের রাজকীয় কর্মকান্ড তারই আয়ত্বাধীন।

ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَنَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَكَلَّمَ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا إِيْمَانًا وَتَصْدِيْقًا وَتَسْلِيْمًا ـ

আমরা বলছি যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং মূসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছেন এ কথাটি আমরা পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি।

জ্ঞাতব্য ঃ ভ্রান্ত দল গুলোর মধ্যে একটি দল হলো মুতাজেলা। তাদের ধারণা হলো, বন্ধুত্ব-প্রেমিক এবং প্রেম পাত্রের মাঝে সম্বন্ধের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে; কিন্তু স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে কোন ধরণের সম্পর্ক নেই। তাই তারা ইব্রাহীম (আঃ)-খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) মূসা (আঃ) কালীমুল্লাহ আল্লাহ তায়ালার (কথক)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্ধু হওয়াকে অস্বীকার করে। পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এবং জাহামিয়া নামক একটি দলও এ ধরণের আক্বীদা পোষণ করে। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রথম উদ্যোক্তা হলো আদ বিন দেরহাম। ইরাকের আমীর খালেদ বিন আব্দুল্লাহ তাকে এ অপরাধের কারণে ঈদের দিন জবাই করে হত্যা করেছিলেন।

ঈমান পাকা পোক্ত করার জন্য যে সব কথা মানা জরুরী, তন্মধ্যে আল্লাহর ফেরেস্তা এবং নবী রাসূল গণের উপর তার সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান রাখাও একটি।

মোট কথা ঈমানের মূল স্তম্ভ সাতটি– (১) আল্লাহর উপর ঈমান রাখা, (২) ফেরেস্তাদের উপর ঈমান রাখা (৩) সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান রাখা, (৪) আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান রাখা, (৫) কেয়ামতের উপর ঈমান রাখা, (৬) তাকদীরের উপর ঈমান রাখা, (৭) জান্নাত এবং জাহান্নামের উপর ঈমান রাখা। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ

আমরা ফেরেস্তাদের উপর নবীদের উপর এবং ঐ সকল কিতাবের উপর যা রাসূলদের উপর অবতরণ করা হয়েছে ঈমান রাখি। আর আমরা এ কথার সাক্ষী দিই যে, সমস্ত নবী উজ্জল সত্যের উপর রয়েছে।

কোন মুসলমানকে কি কাফের বলা যায়

একজন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো অস্বীকার না করবে এবং কোন গোনাহকে হালাল মনে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন পাপ করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। হাঁ সে যদি ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো অস্বীকার করে বসে, তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। যদিও বা সে নামাজ পড়ে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنُسَمِّيْ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مَادَامُوْا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِيْنَ وَلَهُ بِكُلِّ مَاقَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِيْنَ

যারা ক্বিব্‌লামুখী হয়ে নামাজ পড়ে তাদেরকে আমরা মুসলমান, ঈমানদার করে নাম রাখব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত কথাগুলো বিশ্বাস করবে, আর উনার বলা এবং সংবাদ দেয়া কথাগুলো সত্যায়ন করবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা

এ কথাটি ভাল ভাবে বুঝে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালাকে আয়ত্ব এবং কল্পনা করা যায় না। সুতরাং তার সত্তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা নিজের দায়িত্বকে ভুলে যাওয়ার নামান্তর। অতএব আমরা আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে চিন্তা করব না। আর আমরা আল্লাহ তায়ালার ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হব না। অর্থাৎ হক পন্থীদের সাথে ঝগড়া করব না। কেননা ইহা বাতিলের দিকে আহবান এবং ধর্ম বিনষ্টের কারণ। তা ছাড়া বাতিল দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি দল যেমন কোরআন নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে, সে রকম আমরা কোন ঝগড়া ও করব না বরং পূর্ববর্তী লোকদের মত একে আমরা আল্লাহ তায়ালার বাণী মনে করব। এবং বলব যে, উক্ত কোরআন ওহী আকারে হযরত জিব্রাঈল আঃ এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা এ কোরআনকে আল্লাহ তায়ালার কথা হিসেবে মানব মাখলুক বলে হক্ব পন্থীদের সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হব না। আমরা এ কথাও বিশ্বাস করব যে, কোরআনের সমতুল্য অন্য কোন জিনিস নেই ইহা একটি মুজেযা। একথাটি লেখক বলেন।

وَلَانَخُوضُ فِى اللّٰهِ وَلَانُمَارِى فِى دِيْنِ اللّٰهِ وَلَانُجَادِلُ فِى الْقُرْاٰنِ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِيْنُ فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَكَلَامُ اللّٰهِ لَايُسَاوِيْهِ شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِيْنَ وَلَانَقُولُ بِخَلْقِهٖ وَلَانُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

আমরা আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে গবেষণা করবনা। আল্লাহ তায়ালার ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব করব না। কোরআন নিয়ে ঝগড়া করব না। আমরা সাক্ষী দিব যে, উহা আল্লাহ তায়ালার বাণী যা জিব্রাঈল (আঃ) নিয়ে এসেছেন, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের কথা আল্লাহ তায়ালার কথার সমতুল্য কখনো হতে পারে না। আবার কোরআনকে মাখলুকও বলব না, আমরা মুসলমানদের বিরোধিতা করব না।

জ্ঞাতব্য ঃ এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি কোরআনকে সৃষ্ট মনে করবে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবেনা। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর শিক্ষা দেয়াটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং উহাকে অস্বীকার করা অর্থ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা।

ত্রয়োদশ পাঠ

পাপের কারণে কোন মুসলমান ঈমান থেকে বের হয় না

মুতেজলাদের আকীদা হলো কবীরা গোনাহ করলে ঈমান চলে যায়, কিন্তু কাফের হয়না। আর খারেজীদের আকীদা হলো কাফের হয়ে যায়। মুরজিয়াদের আকীদা হলো, ঈমান আনার পর গোনাহ করলে কোন ধরণের অসুবিধা হয় না। উল্লেখিত তিনটি আকীদা ভুল। কারণ কোরআনের মূল পাঠ অনুযায়ী উপরোক্ত আকীদা তিনটি বাতিল হিসেবে গণ্য। এ জন্য আমাদের আকীদা হলো, যদি কোন মুসলমান কোন গোনাহ করে সে পাপি বলে সাব্যস্ত হবে। তবে ঈমান থেকে বের হবে না। আবার আমরা এ কথাও বলি না যে, ঈমান নিয়ে গোনাহ করলে কোন ক্ষতি হয় না। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَانُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَالَمْ يَسْتَحِلَّهُ وَلَانَقُولُ لَايَضُرُّ مَعَ الْأِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ وَنَرْجُوا لِلْمُحْسِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَلَانَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَانَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَانُقَنِّطُهُمْ

কোন মুসলমানকে গোনাহের কারণে আমরা কাফের বলব না যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত গোনাহকে হালাল মনে না করবে। আমরা এ কথাও বলব না যে, ঈমান আনার পর গোনাহ করলে তা পাপির জন্য ক্ষতিকর নয়। আমরা নেক কারদের ব্যাপারে এ আশা রাখি যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমরা একেবারে নির্ভিক নই। আমরা তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত জান্নাতের সাক্ষী দিতে পারি না। আমরা মুসলমানদের মধ্যে যারা গোনাহ গার তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করি। আবার তাদের জন্য ভয়ও রাখি আমরা কাউকে নিরাশ করিনা।

নিশ্চিন্তা ও নৈরাশ্য ইসলামের পরিপন্থি

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল, নির্ভরতা এবং নৈরাশ্যতা উভয়টি ইসলামী রীতির পরিপন্থি। মুসলমানদের পন্থা উভয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ

শাস্তিকে ভয় করা এবং আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা রাখা। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَالْأَمْنُ وَالْأَيَاسُ سَبِيلَانِ عَنْ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ

নিশ্চিন্তা এবং নৈরাশ্যতা উভয়টি এমন পন্থা, যা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থি। আর মুসলমানদের পন্থা এ দুইয়ের মাঝে।

পূর্বে বলা হয়েছে, আমরা মুসলমানদেরকে কাফের বলব না। এতে একথাটি ও বুঝে আসল যে, ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী অস্বীকার করা ছাড়া বান্দা ঈমান থেকে বের হয় না। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ

অনুবাদ ঃ বান্দা ঈমান থেকে বের হয় না কিন্তু ঐ সকল জিনিস অস্বীকার করার কারণে যা সে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করে ছিল। (অর্থাৎ ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী।)

ঈমান পরিচিতি

ঈমান কি? এ ধরণের একটি প্রশ্ন আমাদের অনেকের মধ্যে আছে। এর উত্তর হলো, ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এবং শেখ আবু মনসুর মা'তুরুদী (রহঃ) ঈমান কে একক জিনিস মনে করেন। অর্থাৎ ঈমানের হাকীকত হল শুধু আন্তরিক সত্যায়ন। আর মৌখিক স্বীকার হলো ইসলামী বিধি-বিধান জারি করার জন্য শর্ত স্বরূপ। তত্ত্ববিদদের একটি দল ঈমানকে সংমিশ্রিত বস্তু মনে করে। আবার তাদের মধ্যে দুই গ্রুপ। এক গ্রুপের মত হলো, ঈমান আন্তরিক সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারের সামষ্টিক নাম। এ মতটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) ব্যক্ত করেছেন। আর দ্বিতীয় গ্রুপের মত হল, ঈমান তিনটি জিনিসের সামষ্টিক নাম অর্থাৎ– অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকার এবং বাস্তব কর্ম কান্ড হল ঈমান। আবার এ দলটি দুভাগে বিভক্ত, প্রথম দলটি বান্দার কর্ম কাণ্ডকে ঈমানের পরিপূরক অংশ মনে করে। দ্বিতীয় দলটি তাকে ঈমানের মূল উপাদান মনে করে। প্রথম মতটি মুহাদ্দিসগণ

এবং ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আওযায়ী, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্, মদীনা বাসী এবং জাহেরী এবং দার্শনিকদের। আর দ্বিতীয় মতটি মুতাজেলা এবং খারেজীদের। এ দলটি আমল ত্যাগ কারীদেরকে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করে। অতঃপর মুতাযিলাদের কথানুযায়ী লোকটি ততক্ষণাত কাফের হবেনা। আর খারেজীদের কথানুযায়ী কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু উভয় দল তার পরিণতির ব্যাপারে একমত। অর্থাৎ তওবা না করে মরলে কাফের হিসেবে গন্য হবে। তাছাড়া হক পন্থীদের মাঝে যে মতানৈক্যটি রয়েছে তা শুধু শাব্দিক ক্ষেত্রে। তাই কারো মতানুযায়ী কবীরা গোনাহ কারী ঈমান থেকে বের হবেনা।

অতঃপর ইমাম তাহবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে যা কিছু অবতরণ করেছেন, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, সবগুলোকে সত্য মনে করা ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু ইরশাদ করেছেন তা দুধরণের। (১) ঐ সকল ইরশাদ যার মাধ্যমে তিনি এমন নতুন নতুন আহকাম অনুমোদন করেছেন যা কোরআনে নেই। (২) ঐ সকল ইরশাদ যার মাধ্যমে তিনি কোরআনের আহকামগুলোকে স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) উভয়টির দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন ঃ

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَأَنَّ جَمِيْعَ مَاأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ وَجَمِيْعَ مَاصَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ

ঈমান মৌখিক স্বীকার আন্তরিক সত্যায়ন এবং এ কথা স্বীকার করার নাম যে, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে যা কিছু অবতরণ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব বিধান এবং বক্তব্য বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণিত সব গুলোই সত্য।

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) وان جميع বলে মু'তেজালা এবং রাওয়াফেজ, মুআত্তালা এবং জাহামিয়া প্রমুখ দলের রদ করেছেন। যারা কোরআন এবং হাদীসকে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে মানে না।

ঈমান হ্রাস বৃদ্ধিকে গ্রহণ করে না

সমস্ত মানুষ যেমন কথক প্রাণী হিসেবে সমান এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য শুধু অন্য কারণে। তেমনি সমস্ত ঈমানদার ঈমানের ক্ষেত্রে সমান। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য খোদাভিরুতা,ইখলাছ এবং অন্যান্য কারণে। এতে বুঝা যায় যে, মূল ঈমান হ্রাস বৃদ্ধিকে গ্রহণ করে না। তবে ঈমানের সাথে সংযুক্ত বিষয় অর্থাৎ আমলসমূহ হ্রাস বৃদ্ধিকে গ্রহণ করে। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রাঃ) বলেন,

وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِيقَةِ بِالتَّقْوٰى وَمُخَالَفَةِ الْهَوٰى وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلٰى

ঈমান একক জিনিস ঈমানদারগণ মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সমান, তবে তাদের প্রকৃত পার্থক্য তাকওয়া এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা এবং উত্তম জিনিসকে আকড়ে ধরার কারণে।

মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু

ঈমানদাররা সবাই আল্লাহ তায়ালার বন্ধু, কোরআন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছে। তবে এ বন্ধুত্বের স্তরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা পরহেজগার তারা পুর্ণাঙ্গ বন্ধুত্ব লাভে ধন্য হয়। আর সাধারণ ঈমানদার তারা অপূর্নাঙ্গ বন্ধুত্ব লাভ করে। মুমিনদের মধ্যে যারা বেশী পরহেজগার এবং কোরআনের অনুসরণ বেশী করে তারা বেশী সম্মান পায়। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمٰنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَطْوَعُهُمْ وَاتْبَعُهُمْ بِالْقُرْانِ

সমস্ত মুমিন আল্লাহর বন্ধু। তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে কোরআনের বেশী অনুসরণ করে। ইমাম [illegible] (রহঃ) বলেন।

কটি বস্তুর উপর ঈমান আনতে হয়

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَحُلْوِهٖ وَمُرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَحْنُ مُؤْمِنُوْنَ بِذَالِكَ كُلِّهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَنُصَدِّقُ كُلَّهُمْ عَلٰى مَاجَاءَ بِهٖ

আর ঈমান কয়েকটি জিনিসের উপর বিশ্বাস রাখার নাম। যথা, আল্লাহ তায়ালার উপর তার ফেরেস্তাদের উপর, তার কিতাব সমূহের উপর, তার রাসূলের উপর, কেয়ামতের উপর, পুনরুত্থানের উপর, তাকদীরের উপর ভাল-মন্দ, মিঠা-তিতা সব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয় এই কথার উপর। আমরা উপরোক্ত সকল বিষয়ের উপর ঈমান রাখি। আমরা তার রাসূল গণের মাঝে কোন ধরণের পার্থক্য করি না। বরং সকল নবী এবং তাদের আনিত সকল বিধি বিধানকে স্বীকার করি।

জ্ঞাতব্য ঃ তাকদীরের ভাল-মন্দ কঠিন-সহজ ইত্যাদি বান্দা হিসেবে হয়ে থাকে, অর্থাৎ বান্দার সামনে যা কিছু আসে চাই তা তার মন পুতঃ হোক বা না হোক সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই এসে থাকে।
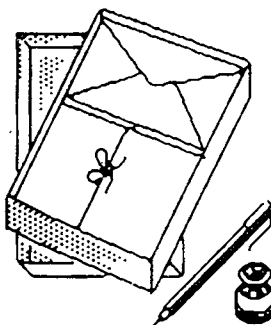
চতুর্দশ পাঠ

কোন মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না

আল্লাহ তায়ালার এ মূলনীতিটি নির্ধারিত যে, কোন মুশরিক এবং কাফেরের জন্য মাগফেরাত কামনা করা যাবে না। আর কোন মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কারণ কোরআনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে তাও সে দেখতে পাবে।

সুতরাং কোন মুমিন যদি সব সময় জাহান্নামে থাকে, তবে উপরোক্ত বাণীটি ঠিক থাকবে না। তাছাড়া এ কথার উপর সকল আলেম একমত যে, সৎকর্মের প্রতিদান শেষ মেষ সামনে আসবেই। অতএব বুঝা গেল, মুমিন বান্দা জান্নাতে যাবেই যদিও তাতে সামান্য বিলম্ব হবে। তবে কথা হলো ঐ সকল মুমিন সম্পর্কে যারা কবীরা গোনাহ করে এবং উক্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। এদের ব্যাপারে কথা হল এরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। এ সম্পর্কে মুতেজালা এবং খাওয়ারেজদের মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু তাদের কথা বাতিল এবং কোরআনের মূল পাঠের পরিপন্থি। আল্লাহ তায়ালা চাইলে উক্ত ব্যক্তির কবীরা গোনাহ মাফ করে দিতে পারেন। আবার চাইলে এর কারণে পাকড়াও করতে পারেন। প্রথমটি তার করুণা এবং অনুগ্রহ আর দ্বিতীয়টি তার ইনসাফ। সগীরা গোনাহের ব্যাপারে কথা হলো যদি মানুষ কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে তার সগীরা গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। আর চাইলে পাকড়া করবেন। কিন্তু মুতেজালা এবং খাওয়ারেজরা বলেন, সগীরা গোনাহের জন্য আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করবেন না।

মোট কথা ঈমানদারদের মধ্যে যাদেরকে স্বীয় অপরাধের কারণে দোযখে প্রবেশ করানো হবে, তাদেরকে কোন এক সময় সেখান থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এটি আল্লাহ তায়ালার রহমত ও তার অনুগ্রহের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার শাফায়াতের মাধ্যমেও হতে পারে। অন্যথায় মুমিনরা যদি সব সময় জাহান্নামে থাকে তবে মুমিন এবং কাফেরের মাঝে কোন ধরণের পার্থক্য থাকবে না। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّارِ لَايَخْلُدُوْنَ إِذَامَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُوْنَ وَإِنْ لَمْ يَكُوْنُوا تَائِبِيْنَ بَعْدَاَنْ لَقُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَارِفِيْنَ وَهُمْ فِى مَشْيَتِهٖ وَحُكْمِهٖ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ وَعَفَاعَنْهُمْ بِفَضْلِهٖ كَمَاذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى كِتَابِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِى النَّارِ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِمْ بِعَدْلِهٖ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهٖ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهٖ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلٰى جَنَّتِهٖ - ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهُ مَوْلَى لِأَهْلِ مَعْرِفَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِى الدَّارَيْنِ كَاَهْلِ نَكِرَتِهِ الَّذِيْنَ خَابُوْا مِنْ هِدَايَتِهٖ وَلَمْ يَنَالُوْا مِنْ وَلَايَتِهٖ اَللّٰهُمَّ يَاوَلِىَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ مُسْكِنًا بِالْاِسْلَامِ حَتّٰى نَلْقَاكَ بِهٖ

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের মধ্যে কবীরা গোনাহের পাপিরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করা সত্বেও যদি তওবা না করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদ স্বীকার করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কবীরা গোনাহের পাপিরা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার আওতাধীন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা তার পাক কোরআনে বলেছেন তিনি কুফর শিরকের অপরাধি ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেদেন। আর তিনি চাইলে নিজের ন্যায় বিচার হিসেবে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর স্বীয় রহমত এবং নেক বান্দাদের সুপারিশক্রমে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা যে সকল লোক তার পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছেন তাদের অভিভাবক। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উভয় জাহানে ঐ সকল কাফেরদের মত করবেন না, যারা তার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত

রয়েছেন এবং তার অভিভাবকত্ব অর্জন করতে পারেননি। হে আল্লাহ আপনি ইসলাম এবং মুসলমানদের অভিভাবক। আপনি আমাদেরকে ইসলামের উপর স্থির রাখুন। যাতে আমরা ইসলাম নিয়ে আপনার সাক্ষাত করতে পারি।

যে কোন মুসলমানের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ

হক্ব পন্থীদের আক্বীদা সমূহের মধ্যে একটি আক্বীদা হলো, যেকোন মুসলমানের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ হওয়া। চাই সে নেককার হোক বা ফাসেক বা বদকার হোক। তবে মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। এখানে আলোচনা হলো শুধু বৈধতা নিয়ে সুতরাং ফাসেক বা বদকার মুসলমানের পেছনে যদি নামাজ পড়া হয় তবে নামাজ ফাসেদ হবে না। দারে কুতনী নামক হাদীস গ্রন্থে আছে, "তোমরা যে কোন নেককার ও বদকার লোকের পেছনে নামাজ পড়। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে নামাজ পড়াকে বৈধ বলে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামাজ পড়াকেও বৈধ মনে করে। তাইতো সাহাবা গণ অনেক ফাসেক এবং বদকারের পেছনে নামাজ পড়তেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হাজ্জাজের পিছনে নামাজ পড়তেন।

শিরক এবং কুফরের কোন কর্মকাণ্ড প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কাউকে কাফের এবং মুশরেক বলব না। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাথে কি ব্যবহার করবেন সেটি তার সোপর্দ করব। তবে সৎ কর্মীদের ব্যাপারে ক্ষমার আশা রাখব। আর অসৎ কর্মীদের ব্যাপারে ভয় করব।

এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنَرَى الصَّلٰوةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَّلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَالَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّنْ ذٰلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুবাদ ঃ আমরা মুসলমানদের মধ্যে যে কোন সৎ এবং অসৎ ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়াকে বৈধ মনে করি। মুসলমানদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের উপর জানাযার নামাজ পড়াকে বৈধ মনে করি, আমরা কোন মুসলমানকে জান্নাত বা দোযখে নামাব না। (অর্থাৎ নিশ্চিত ভাবে তাদেরকে জান্নাতী বা দোযখী বলব না।)

তাদের ব্যাপারে আমরা কুফর-শিরক এবং নেফাকের সাক্ষী দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত বর্ণিত জিনিসগুলো থেকে কোন একটি তাদের মধ্যে পাওয়া না যাবে। আর আমরা তাদের রহস্যকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করব।

কাদের জানাযা পড়া বৈধ নয়

যে কোন মুসলমানের জানাযার নামাজ পড়া বৈধ। তবে ইসলামী আইনবিদরা লোকের জানাযার নামাজ পড়াকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা হলেন– (১) রাষ্ট্রদ্রোহী (২) ডাকাত (৩) আত্মহত্যাকারী। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এর উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে। আর যে নিজের পিতামাতাকে হত্যা করে তার উপরও জানাযার নামাজ পড়া বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহঃ) বলেন এ হুকুমটি ঐ সময়ের জন্য যখন পিতা-মাতার হত্যাকারীকে রক্তের বদলা হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা করে দিবে। আর যদি সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তবে তার জানাযার নামাজ পড়া বৈধ হবে।

কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়

আমাদের আরেকটি আক্বীদা হলো, আমরা মুসলমানের উপর তলোয়ার উঠানোকে বৈধ মনে করব না। হাঁ সে যদি এমন কোন আচরণ করে যার কারণে তার উপর তলোয়ার উঠানো বৈধ হয়ে যায় তবে অন্য কথা। যেমন বিবাহিত অবস্থায় যেনা করল, বা কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করল, স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমানদের বিরোধিতা করা শুরু করল ইত্যাদি। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَانَرَى السَّيْفَ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّامَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ

অনুবাদ ঃ আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের মধ্যে কারো উপর তলোয়ার উঠানোকে বৈধ মনে করব না। হাঁ যার উপর তলোয়ার উঠানো জরুরী হয়ে পড়ে।

আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং মতানৈক্য একটি বড় বিপদ এতে ইসলামী শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এ জন্য আমরা আমাদের শাসক এবং দায়িত্বশীলদের

বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন সত্ত্বেও বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করব না। বরং তাদের আনুগত্যকে জরুরী মনে করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বিরোধিতা করে কোন হুকুম জারী না করবে, ততক্ষণ আমরা তাদের আদেশ পালন করাকে আবশ্যক মনে করব। কারণ আল্লাহ তায়ালার হুকুম হল, তোমরা তোমাদের শাসন কর্তার আনুগত্য কর। সুতরাং আমরা নিজেদের শাসন কর্তাদের আনুগত্য ত্যাগ করব না এবং তাদের জন্য বদ দোয়া ও করব না। বরং মঙ্গল এবং মাগফেরাতের দোয়া করব। এক্ষেত্রে আমরা সাহাবাদের অনুকরণ করব। তারা ফাসেক শাসনকর্তাদের আনুগত্য ও করেছেন। আমরা এমন কথা থেকে বেঁচে থাকব যা মুসলমানদের বিরোধী। আমরা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করব না যা পূর্ববর্তী লোকদের পরিপন্থী। আমরা ইনসাফগার এবং সত্যবাদীদেরকে ভালবাসব। অত্যাচারী এবং বিশ্বাস ঘাতকদের ঘৃণা করব।
ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন

وَلَانَرَى الْخُرُوجَ عَلٰى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوْا وَلَانَدْعُوا عَلَيْهِمْ وَلَانَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرٰى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَالَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاتِ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوْذَ وَالْخِلَافَ وَالْفِرْقَةَ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ

অনুবাদ ঃ আর আমরা আমাদের ইমাম এবং শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করব না। যদিও বা তারা জুলুম করুক। আমরা তাদের জন্য বদ দোয়া করব না। তাদের আনুগত্য ছাড়ব না। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কারণে আমরা তাদের আনুগত্যকে ফরজ মনে করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন গোনাহের আদেশ না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের জন্য সৎ এবং সঠিকতার দোয়া করব। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুকরণ করব। আমরা বিচ্ছিন্নতা-মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্ব থেকে বেঁচে থাকব। আমরা ন্যায়পন্থী এবং বিশ্বস্তদেরকে মহব্বত করব। জুলুমবাজ এবং বিশ্বাস ঘাতকদের ঘৃনা করব।

পূর্ণাঙ্গ দাসত্বের তাগাদা হলো পরহেজগার এবং ন্যায় পন্থীদেরকে মহব্বত করা আর তাদের বিপরীতদেরকে ঘৃনা করা। কিন্তু ইসলাম ইমাম এবং বিচারকদের আনুগত্যের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। এ জন্য ইমামদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি নেই। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنَقُولُ اللّٰهُ اَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ

যে সকল জিনিস আমাদের নিকট সন্দেহপূর্ণ মনে হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা বলব আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

মৌজার উপর মাসেহ করা সুন্নীদের নিদর্শন

শিয়ারা মৌজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করে না। বরং পায়ের উপর মাসেহ করতে বলে। অথচ উম্মতের ঐক্যমত তাদের উভয় কথার বিরুদ্ধে। আমরা পূর্ববর্তী সৎ লোকদের বিরোধিতা করব না। কোরআন হাদীসের আহকামকে সত্য বলব। মৌজার মাসেহ সম্পর্কে যে সকল হাদীস উল্লেখ রয়েছে তা প্রায় সত্তর জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মৌজার উপর মাসেহ বিষয়ক হাদীসগুলো আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় উজ্জল হয়ে উঠেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা বৈধ হওয়ার কথা বলিনি। ইমাম কুরখী (রহঃ) বলেন, যারা মৌজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করে না তাদের কুফরীর ব্যাপারে আমার আশংকা রয়েছে। কারণ এ সম্পর্কীয় হাদীস ধারাবাহিকতার স্তরে পৌছেগেছে। এ জন্য কোন কোন বুজুর্গ বলেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন হলো, হযরত আবুবকর এবং হযরত উমরকে উম্মতের মধ্যে সবার উপর মর্যাদা দান করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই জামাতাকে মহব্বত করা, মৌজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করা।এ জন্য ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِى الْأَثَرِ

আর আমরা বাড়ীতে অবস্থান কালে এবং সফরের সময় মৌজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করি, যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

পঞ্চদশ পাঠ

হজ্ব এবং জিহাদ পরিচালনার জন্য কি নেক্কার ইমাম শর্ত

ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি হলো হজ্ব। এছাড়া ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর মধ্যে জেহাদ করাও একটি। এই দুইটি ফরজ এমন যা কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে। কেউ এগুলোকে রহিত করতে পারবে না। কিন্তু উভয়টি আদায় করার জন্য ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ আমীর এবং শাসনকর্তার প্রয়োজন রয়েছে। হজ্বের জন্য এমন একজন আমীরের প্রয়োজন রয়েছে। যার অধীনে হজ্বের আহকামগুলো পালন করা যায়। আবার জেহাদের জন্যও একজন আমীরের প্রয়োজন রয়েছে যার তত্ত্বাবধানে উহা আদায় করা সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হলো যদি হজ্বের আমীর অথবা ফৌজদের সর্বাধিনায়ক ফাসেক বা বদকার হয় তবে কি করবে? তখন হুকুম হলো তার আনুগত্য করা এবং তার তত্ত্বাবধানে ঐ ফরজগুলো আদায় করা। শিয়ারা এ দুইটি ফরজ আদায় করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে তারা বলে হজ্ব এবং জেহাদের জন্য ইমাম নিষ্পাপ হওয়া জরুরী তাদের এ কথাটি বাতিল। এ জন্য ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا

হজ্ব এবং জেহাদ মুসলমান ইমামের তত্ত্বাবধানে চাই নেককার হোক বা বদকার কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোন কিছু উহাকে রহিত বা ভণ্ডল করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই দুইটি জিনিসের জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। আর ব্যবস্থাপনা যেমন- ন্যায় বিচারক ইমাম করতে পারে তেমনি যে কোন ফাসেক এবং পাপিও করতে পারে।

কাঁধের ফেরেস্তা এবং মৃত্যুর ফেরেস্তার উপর ঈমান রাখতে হবে

মুফাসসেরগণ বলেছেন, মানুষের নিকট চারটি ফেরেস্তা থাকে তন্মধ্যে দুই জন ফেরেস্তা বান্দার আমলগুলো লেখে, আর দুই জন তাকে হেফাজত করে। যখন তাকদীরের লিখিত কোন বিষয় সামনে আসে, তখন তারা সরে পড়ে। বান্দার ক্রিয়াকলাপ যারা লেখে তাদেরকে কোরআনে কেরামান কাতেবীন বলা হয়েছে, অর্থাৎ সম্মানিত লেখক। পরবর্তীতে এই নামেই তাদেরকে ডাকা আরম্ভ হয়। এই ফেরেস্তাগুলো দুই জন করে চার জন দিনের বেলায় মানুষের কাছে থাকে আর দুই জন করে চার জন রাতের বেলায় থাকে। ফজর এবং আছরের নামাজের সময় উভয় দলের মাঝে পরস্পর সাক্ষাত হয়। অর্থাৎ আগমনকারী এবং গমনকারী উভয় গ্রুপ উক্ত সময়ে একত্রিত হয়। রাতের দলটি ফজরের নামাজের পর চলে যায়। আর দিনের দলটি আছরের পর চলে যায়। সুতরাং আমরা এই ফেরেস্তা গুলোর উপর ঈমান রাখব। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

نُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِيْنَ

আমরা সম্মানিত দুই ফেরেস্তার উপর ঈমান রাখব। আর এ কথার উপর ঈমান রাখব যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আমাদের রক্ষক বানিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত ফেরেস্তাদের অবস্থা হলো, তারা বিশ্বাস ঘাতক নয়। কোন আমল না লিখে রেখেও দেন না। আর আমাদের কর্মকান্ড তাদের থেকে গোপন ও নয়।

এ ছাড়া কোরআনে প্রাণ হরণকারী যে ফেরেস্তাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমরা তার উপর ও ঈমান রাখি। কোরআনে বলা হয়েছে,

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

হে নবী আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। কিন্তু বাহ্যত এ কথার উপর প্রশ্ন হয় যে, কোন কোন আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রান হরণকারী ফেরেশতা একাধিক যেমন কোরআনে বলা হয়েছে।

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ

এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়।

এ বিপরীত মুখী কথাটি এভাবে মিলানো যায় যে, মূলত ইস্রাঈলই সমস্ত প্রাণ হরণ করেন পরে রহমতের ফেরেশ্তা অথবা আযাবের ফেরেশতারা তার থেকে নিয়ে নেন। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعٰلَمِيْنَ

আমরা মৃত্যুর ঐ ফেরেশ্তাকেও বিশ্বাস করি যিনি তাবৎ বিশ্ববাসীর প্রাণ হরণ করার জন্য নিয়োজিত রয়েছেন।

কবরের সুখ-শান্তি সত্য

কোরআন শরীফে কবরের সুখ শান্তির কথা উল্লেখ হয়েছে, আর বিভিন্ন হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কেউ তো কবরে শাস্তি ভোগ করবে, আর কেউ খুব শান্তিতে থাকবে। মুনকার নকীর নামক দুই জন ফেরেশতা কবরে প্রশ্ন করবে, তাদের প্রশ্ন হবে আল্লাহ তায়ালা-দ্বীন এবং তার পয়গম্বর সম্পর্কে, ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيْمِهٖ لِمَنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلًا وَبِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ لِلْمَيِّتِ فِيْ قَبْرِهٖ عَنْ رَبِّهٖ وَنَبِيِّهٖ وَدِيْنِهٖ عَلٰى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهٖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

আমরা কবরের আযাব এবং তার শান্তির উপর ঈমান রাখি, ঐ লোকদের জন্য যারা তার উপযুক্ত। এছাড়া মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার প্রতি পালক, নবী এবং ধর্ম সম্পর্কে মুনকার নাকীর ফেরেস্তাদ্বয় প্রশ্ন করবেন, আবার তাও করা হবে ঐ বর্ণনা অনুযায়ী যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের থেকে বর্ণিত তা আমরা বিশ্বাস করি। যে কোন মানুষ মৃত্যুর পর কেয়ামতের আগে মধ্যবর্তী একটি অবকাশের সম্মুখিন হবে। এটি কবরেও হতে পারে অন্য কোন জায়গায়ও হতে পারে।

সেখানে তাকে পূর্বোল্লেখিত প্রশ্নগুলো করা হবে। এরপর তার আমল অনুযায়ী কেয়ামতের পরবর্তী অবস্থাগুলো চিত্র আকারে তার উপর আসতে থাকবে।

সুতরাং কবর কারো জন্য জান্নাতের বাগান হবে, আর কারো জন্য দোযখের গর্ত হবে। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন–

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ

অনুবাদ ঃ কবর জান্নাতের বাগান সমূহ থেকে একটি বাগান হবে অথবা জাহান্নামের গর্ত সমূহ থেকে একটি গর্ত হবে।

পূনরুত্থান, প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ আমলনামা ও পুলসেরাত সত্য

মৃত্যুর পর কবরে গিয়ে মানুষের জীবন শেষ নয়, বরং নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর সবাইকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আল্লাহর দরবারে হাজির করানো হবে। কর্মের প্রতিদান বা শাস্তি সামনে আসবে। এ বিষয়গুলোর উপরও আমরা ঈমান রাখি এবং এগুলো আমরা সত্য মনে করি। এছাড়া বান্দার হিসাব নিকাশও হবে, হিসাব নিকাশে কারো উপর সহজ করা হবে কারো উপর কঠোরতা করা হবে। সহজ হিসাবের নিয়ম হলো আল্লাহ তায়ালা বান্দার সামনে তার গোনাহগুলো প্রকাশ করে দিবেন আর তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করবেন পরে আল্লাহ তায়ালা সেগুলো গোপন রাখবেন। এ ছাড়া সমস্ত লোক নিজেদের আমল নামা পড়বে। কাউকে আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে কাউকে বাম হাতে দেয়া হবে। আমল নামা যে ধরণের হবে সে ধরণের ফল পাওয়া যাবে। আমল নামা হিসেবে সাওয়াব এবং প্রতিদান দেয়া হবে অথবা আযাব এবং শাস্তি দেয়া হবে। এ ছাড়া জাহান্নামের উপরে একটি পুল থাকবে যা সবাইকে পাড়ি দিতে হবে। জান্নাতীরা মর্যাদানুসারে পুলটি হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর জাহান্নামীরা কেটে-কেটে নীচে পড়ে যাবে। আমরা এ সব বিষয়ের উপরও ঈমান রাখি। এ ছাড়া আমরা ন্যায় নিক্তির উপরও ঈমান রাখি অর্থাৎ এ কথার উপরও ঈমান রাখি যে, আমলসমূহ মাপা হবে আর মাপার জন্য নিক্তি দাঁড় করানো হবে।

পুনরুত্থানের স্বরূপ হল শরীর গুলোকে জীবিত করে কেয়ামতের মাঠে জমা করে রাখা হবে এ কথাটিও সত্য এর উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। কোরআন এবং হাদীসে এ সকল বিষয় সত্য হওয়ার অসংখ্য দলীল রয়েছে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَآةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْبَعْثُ هُوَ حَشْرُ الْأَجْسَادِ وَإِحْيَاءِ هَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

পুনরুত্থান এবং কেয়ামতের দিন কর্মের ফল প্রদান, হিসাব-নিকাশ, আমল নামার পাঠ, প্রতিদান আর শাস্তি, পুলসিরাত এবং আমল নামার নিক্তি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আমরা ঈমান রাখি। আর এখানে "বায়াছ" পুনরুত্থান অর্থ শরীর সমূহকে একত্রিত এবং পুনর্জীবিত করা।

জান্নাত জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্য

মুসলমানদের অন্যান্য আক্বীদার মধ্যে একটি আক্বীদা হলো জান্নাত এবং দোযখের অস্তিত্বের উপর ঈমান রাখা। যারা এই দুটির অস্তিত্বকে কাল্পনিক এবং উপমেয় মনে করে তাদের ধারণাকে আমরা অসত্য মনে করি। তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, জান্নাত এবং দোযখের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে না সামনে সৃষ্টি করা হবে? কোন কোন ভ্রান্ত লোকের ধারণা হলো সৃষ্টি করা হবে, অথচ কোরআন হাদীসের মূল পাঠ অনুযায়ী কথাটি বাতিল। কারণ আদম (আঃ) এর জান্নাতে থাকা এবং কোরআনের ঘোষণা করা যে, জান্নাত পরহেজগারদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। জান্নাত এবং দোযখ এবং উহাদের অধিবাসীরা সবসময় সেখানে থাকবে, ইত্যাদী কথাগুলোর দ্বারা উপরোক্ত কথাটি বাতিল হওয়া বুঝা যায়। তবে কাদেরকে বেহেস্তের জন্য এবং কাদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তা অনেক আগ থেকেই জানেন। মানুষের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাত এবং দোযখ বানিয়ে রেখেছেন। এরপর উভয়ের অধিবাসীদের সৃষ্টি করেছেন। যাদেরকে তিনি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা তার অবদান আর যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা তার ইনসাফ। এখন যে কোন লোক আমল করবে তা তার পূর্বের সিদ্ধান্ত

অনুযায়ীই করবে। আর প্রতিটি ব্যক্তি ঐ স্থানে গিয়ে পৌঁছুবে। যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট কথা ভাল মন্দ যা কিছু বান্দার সামনে আসে তা পূর্বের সিদ্ধান্ত মাত্র। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ خَلَقَ لَهُمَا اَهْلًا فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ ـ عَدْلًا مِنْهُ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا فُرِغَ مِنْهُ وَصَائِرًا اِلٰى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ ـ

জান্নাত এবং দোযখ উভয়টি সৃষ্ট, যা কখনো নিঃশেষ হবেনা ধ্বংস ও হবেনা। আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির পূর্বেই জান্নাত এবং দোযখ সৃষ্টি করে রেখেছেন। অতঃপর উভয়ের অধিবাসীদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে চেয়েছেন স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর যাদেরকে চেয়েছেন স্বীয় ইনসাফ অনুযায়ী দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি লোক এমন জিনিসের জন্য আমল করছে। যা পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে আবার প্রতিটি লোক ঐ স্থানে গিয়ে পৌঁছুবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাল মন্দ সবকিছু আল্লাহ তায়ালার মর্জির অধীন।
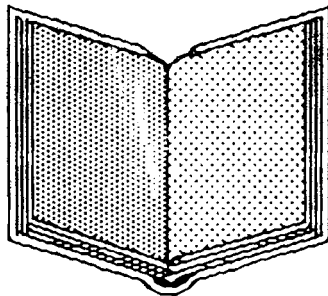
ষষ্ঠদশ পাঠ
বান্দার সামর্থ্য দু প্রকার

মানুষ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তার ইবাদতের জিম্মাদার। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ পূর্ণাঙ্গ শক্তির অধিকারীও নন, আবার সম্পূর্ণ অক্ষমও নন। যদি সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম হতো তাহলে কিছু করতে পারতনা। অথচ ইহা বাস্তব বিরোধী। আর যদি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হতো তবে যে কোন কাজ করতে পারত, কিন্তু ইহাও বাস্তব বিরোধী। সুতরাং বুঝা গেল মানুষ সক্ষমশালী তবে যে কোন জিনিসের উপর সক্ষম নন।

মানুষ যেহেতু ইবাদতের জিন্মাদার তাই ইবাদত সম্পাদনের জন্য তার মধ্যে শক্তি এবং ইচ্ছা থাকা একটি স্পষ্ট কথা। নতুবা তার উপর এমন কাজ চাপিয়ে দেয়া হবে যা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। অথচ এরূপ করা বৈধ নয়। কোরআনে বলা হয়েছে। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا প্রতিটি মানুষকে এমন কাজের জিম্মাদার বানানো হয়েছে যা করা তার জন্য সম্ভব। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَالْاِسْتِطَاعَةُ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا الْاِسْتِطَاعَةُ الَّتِى يُوجَدُ بِهَا الْفِعْلُ نَحْوَ التَّوْفِيْقِ الَّذِىْ لَايَجُوْزُ اَنْ يُّوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهٖ فَهِىَ مَعَ الْفِعْلِ وَاَمَّا الْاِسْتِطَاعَةُ الَّتِىْ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوَسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْاٰلَاتِ فَهِىَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخَطْبُ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ هِىَ خَلْقُ اللّٰهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ -

সামর্থ্য দুপ্রকার, একটি হলো এমন সামর্থ্য যার সাথে কর্ম পাওয়া যায়, যেমন- এমন তৌফীক যার সাথে বান্দার গুণান্বিত হওয়া জায়েয নেই। এই সামর্থ্যটি কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর যে সামর্থ্য সুস্থতা সক্ষমতা এবং উপায় উপকরণের নিরাপত্তার দিক থেকে হয়ে থাকে, তা কর্মের পূর্বে পাওয়া যায়। আর এ সামর্থ্যের সাথে আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্পৃক্ত

থাকে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি শক্তি অনুযায়ী মানুষকে কাজের জিম্মাদার বানান। বান্দার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্যন।

উল্লেখিত কথাটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, বান্দার সামর্থ্য দুপ্রকার, প্রথম প্রকার উহাই যাকে উপায়- উপকরণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির নিরাপত্তা এবং সুস্থতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। আর ঐ সকল গুণাবলী বান্দার মধ্যে পাওয়া যায়। এই সামর্থ্যটি কর্মের পূর্বেই বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বান্দা নামাজের জিম্মাদার এর জন্য প্রথম থেকে উপায়- উপকরণ ইত্যাদী এবং সুস্থ এবং নিরাপদ থাকা দরকার। মোট কথা এ সামর্থটি কর্মের পূর্বেই পাওয়া যায়। আর ঐ সকল গুণাবলীর বলে বান্দা যা কিছু করবে তা তার উপার্জিত কর্মই হবে।

সামর্থ্যের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা কর্মের পূর্বে পাওয়া যায় না বরং কর্মের সাথে সাথেই থাকে। একে ভিন্ন শব্দে খালক বা সৃষ্টি বলা হয়। অর্থাৎ বান্দা যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন– তখন ঐ কাজের উপায় উপকরণ অবলম্বন করা হলে আল্লাহ তায়ালা কাজটি সৃষ্টি করে দেন। ফলে কাজটি প্রকাশ লাভ করে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللّٰهُ اِلَّامَا يُطِيْقُوْنَ وَلَايُطِيْقُوْنَ اِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ وَهُوَ تَفْسِيْرُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ نَقُوْلُ لَاحِيْلَةَ لِاَحَدٍ وَلَاحَوْلَ لِاَحَدٍ وَلَاحَرَكَةَ لِاَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِلَّابِمَعُوْنَةِ اللّٰهِ وَلَاقُوَّةَ لِاَحَدٍ عَلٰى اِقَامَةِ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالثُّبَاتِ عَلَيْهَا اِلَّابِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন কাজের জিম্মাদার বানিয়েছেন, যা করতে তারা সক্ষম। আর তারা একমাত্র ঐ সকল কাজ করতে সক্ষম যে গুলোর জিম্মাদার তাদেরকে বানানো হয়েছে। ইহাই لاحول ولاقوة الا بالله এর ব্যাখ্যা। আমরা বলি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার কারো কোন কৌশল কোন শক্তি কোন ক্রিয়া ফলপ্রসু হয় না। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার তৌফিক ছাড়া তার ইবাদত এবং ইবাদতে অবিচল থাকার কারো কোন সামর্থ্য নেই।

সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা জ্ঞান এবং ফয়সলা অনুযায়ী চলে

ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللّٰهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ فَغَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَضَائُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ اَحَدًا لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۔

প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা-জ্ঞান এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং তার ইচ্ছা সকল ইচ্ছার উপর তার সিদ্ধান্ত সকল কৌশলের উপর প্রধান্য বিস্তার করে। আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই করেন, তিনি কারো উপর জুলুম করেন না। তিনি যাই করবেন সে ব্যাপারে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবেনা। কিন্তু তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন।

মাগফেরাত কামনা মৃতদের জন্য উপকারী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, জীবিতরা মৃতদের জন্য যে সব দোয়া করে এবং বিভিন্ন ভাল কাজের মাধ্যমে যেসব সাওয়াব পৌছিয়ে থাকে তার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়। কোরআনে মৃত্যুব্যক্তিদের জন্য মাগফেরাত কামনা করার কথা উল্লেখ আছে। আর এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও বর্ণিত রয়েছে, তবে মুতেজালারা একথাটি অস্বীকার করে। তারা কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে দলীল হিসেবে পেশ করে। কিন্তু তাদের কথাটি উম্মতের ঐক্যমত এবং কোরআনের মূল পাঠের পরিপন্থি। এ ছাড়া জানাযার নামাজ বৈধ হওয়া ও উক্ত উপকারের উজ্জল প্রমাণ। কারণ জানাযার নামাযের উদ্দেশ্যই হল মাগফেরাত কামনা করা। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَفِيْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ وَصَدَقَتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْاَمْوَاتِ

জীবিতদের দোয়া এবং সাদাকা করার মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি গুণাবলী

আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রকার নেক দোয়া কবুল করেন এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। তিনি সব কিছুর মালিক কেউ তার মালিক নন। কোন জিনিস এক মুহুর্তের জন্য এবং চুখ মিট মিটানোর মত সময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা থেকে বিমুখ থাকতে পারে না। আর যে এক মুহুর্তের জন্য আল্লাহ তায়ালা থেকে বিমুখ থাকবে সে কাফের এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে রাজী থাকা এবং রাগ করা ও একটি গুণ, কিন্তু তার রাগ এবং সন্তুষ্টি মাখলুকের খুশি এবং আনন্দের মত নয়। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَسْتَجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِى الْحَاجَاتِ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلَاغِنٰى عَنِ اللّٰهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنٰى عَنِ اللّٰهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِيْنِ وَاللّٰهُ يَغْضَبُ وَيَرْضٰى لَاكَاَحَدٍ مِّنَ الْوَرٰى ۔

আল্লাহ তায়ালা নেক দোয়াসমূহ কবুল করেন। উদ্দেশ্য সমূহ পূর্ণ করেন। তিনি সকল জিনিসের মালিক, কেউ তার মালিক নন। এক মুহুর্তের জন্য কেউ আল্লাহ তায়ালা থেকে উদাসীন হতে পারে না। যে, এক মুহুর্তের জন্য আল্লাহ তায়ালা থেকে উদাসীন হবে সে কাফের এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন এবং সন্তুষ্ট হন তবে মাখলুকদের কারো রাগ বা সন্তুষ্টির মত নয়।

আল্লাহ তায়ালা কখনো রাগ করেন, আবার কখনো সন্তুষ্ট হন। কোরআনে উভয়টির প্রমাণ রয়েছে। যেমন- কোরআনে বলা হয়েছে, لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পদ করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

সাহাবাদের ভালবাসা অপরিহার্য

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে সাহাবাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। সাহাবাদের উপর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কথা কোরআনে এভাবে উল্লেখ আছে যে, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ তিনি তাদেরকে মহব্বত করেন আর তারা তাকে মহব্বত করেন। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তাদেরকে মহব্বত করেন তাই তারা আল্লাহ তায়ালার প্রিয়। সুতরাং মানুষের উচিত তাদেরকে মহব্বত করা। এছাড়া সাহাবাদেরকে মহব্বত করা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার কারণেই হয়ে থাকে।

হাদীসে আছে, مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ। যারা তাদেরকে মহব্বত করে তারা আমার মহব্বতের কারণে তাদেরকে মহব্বত করে। আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে তারা আমার সাথে শত্রুতা করার কারণে তাদের সাথে শত্রুতা করে।

মোট কথা সাহাবাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা এবং নবীজীরও মহব্বত আছে। সুতরাং ইনসাফের দাবী হলো তাদেরকে মহব্বত করা। এজন্য আমরা সাহাবাদেরকে মহব্বত করবো এবং করি। আর যারা সাহাবাদেরকে ঘৃণা করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। উল্লেখ্য যে, শরীয়ত অন্যান্য ব্যাপারে যেমন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তেমনি সাহাবাদের মহব্বতের ব্যাপারে ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এতে কোন ধরনের বাড়া বাড়ি করে না। সাহাবাদেরকে তাদের মর্যাদা থেকে আগে বাড়ানো যাবেনা যেমন শিয়ারা হযরত আলী এবং নবী পরিবারকে নিয়ে এ রকম বাড়া বাড়ি করে। আবার তাদেরকে তাদের মর্যাদা থেকে নীচেও নামানো যাবেনা, যেমন খারেজীরা এরকম করেছে। তারা হযরত আলী (রঃ) হযরত উসমান (রঃ) এবং নবী পরিবারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

কিন্তু উভয় পন্থা ভুল, হক্ব পন্থা উহাই যা হক পন্থিরা অবলম্বন করেছেন। তাদের মধ্যে কোন ধরনের বাড়া বাড়ি নেই। তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেককে স্ব-স্বস্থানে রেখেছেন। কোন সাহাবীকে তার স্থান থেকে সরাননি তারা বলেছেন যে, সাহাবাদের প্রশংসা করা চাই, তাদের কুৎসা রটানো জায়েজ নেই। তাদের সমালোচনা করলে দ্বীনের ক্ষতি হয়। তাদের পরে যে সব ফকীহ-মুজতাহিদ-কুতুব-গউস আগমন করবে তারা সাহাবাদের সমকক্ষ হতে পারবেনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক কতইনা ইনসাফ পূর্ণ কথা বলেছেন, তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) উত্তম না হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ। একথার উত্তরে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জেহাদ করার সময় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ঘোড়ার নাকে যে ধুলো বালি ঢুকেছে। হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ সেগুলোর সমতুল্যও হবেনা। সুতরাং আমরা সকল সাহাবাকে মহব্বত করব এবং তাদের সু আলোচনা করবো। বাতিল দলগুলোর মত কারো বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবোনা। তাদেরকে যারা ঘৃণা করবে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করবো। আর ইহাই আল্লাহকে মহব্বত করা এবং তার সাথে শত্রুতা রাখার দাবী। সাহাবাদের মহব্বত করাকে আমরা দ্বীন এবং ঈমান এবং নিষ্টা মনে করি। আর তাদেরকে ঘৃণা করাকে কুফরী-নেফাক এবং অবাধ্যতা মনে করি-

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَانُفْرِطُ فِىْ حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَانَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُّبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ وَلَانَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَإِيْمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ

আর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে মহব্বত করি। তাদের মহব্বতের ব্যাপারে কোন ধরনের বাড়া বাড়ি করিনা। আবার কারো বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করিনা। যারা তাদেরকে ঘৃণা করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। যারা তাদেরকে অসৎভাবে স্মরণ করে তাদেরকেও আমরা ঘৃণা করি। আমরা তাদের সু আলোচনা করবো। তাদের মহব্বত দ্বীন ঈমান এবং নিষ্টার অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী-নেফাক এবং অবাধ্যতার নামান্তর।

ব্যাখ্যা ঃ শিয়া-খাওয়ারেজ-মওদুদী সকলে সাহাবাদের সম্পর্কে কুটক্তি করেছে, তবে পদ্ধতি ভিন্ন। তাদের মধ্যে মওদুদী সবচেয়ে স্পর্শ কাতর এবং সবচে বেশী চালাক। এরা সাহাবাদের বিরুদ্ধে বিষোধগার করে আর দ্বীনের ক্ষতি করে আবার সাহাবাকে বাদ দিয়ে কোরআন বুঝতে চায়। আমরা তাদের সবাইকে গোমরাহ মনে করি। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এবং গোমরাহ জামায়াত থেকে রক্ষা করুক।

সপ্তদশ পাঠ

সাহাবাদের মধ্যে খোলাফায়েরা সর্বশ্রেষ্ঠ

সকল সাহাবীদের মধ্যে আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। আবার খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)। আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া পূর্ববর্তী-পরবর্তী যতলোক আছে সবার মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কে সর্বোত্তম মনে করি। তাদের খেলাফতের বিন্যাস তাদের মর্যাদা অনুযায়ী বিদ্যমান। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)। এই চারজন খলীফার খেলাফত হক হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত। আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফতের ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে। সমস্ত সাহাবা তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনিই এর যোগ্য ছিলেন, কেননা তিনি সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং নবীগণ ব্যতীত সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট। ওনার খেলাফতের ব্যাপারে কোরআনে স্পষ্ট কোন বর্ণনা না থাকলেও কিছু-কিছু হাদীসে ওনার খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

এ কারণেই সকল সাহাবা ওনার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন। ওনার খেলাফত যখন প্রমাণ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে ওনার আদেশ পালন করাও আবশ্যক হয়েপড়ে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শেষ পর্যায়ে হযরত উমর (রাঃ) কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেন। তিনি তার ব্যাপারে কোন কোন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করে ছিলেন। সবাই বলেন, তিনি অত্যন্ত ভাল লোক। এরপর তিনি হযরত উসমান (রাঃ) কে ডেকে স্বীয় অঙ্গীকার নামাটি লেখান। পরে অঙ্গীকার নামাটি বন্ধ করে লোকদেরকে বলেন, এ কাগজে যার নাম লেখা আছে তার বাইআত গ্রহণ করুন। উত্তরে সকলে বললেন, এতে যার নামই লেখা থাক না কেন আমরা তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। এরপর সকল সাহাবা হযরত উমর (রাঃ) এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এভাবে হযরত উমর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তার জীবনের শেষ পর্যায়ে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন

করেন। যেন তারা তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে খলীফা নিযুক্ত করেন। ঐ ছয়জন ব্যক্তি হলেন হযরত উসমান, আলী, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা, যোবাইর, সাদ বিন আবী ওয়াক্বাস। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে পাঁচজন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে তাদের ক্ষমতা এই বলে হস্তান্তর করে দেন যে, আপনি যাকে খুশি খলফিা নিযুক্ত করুন, আমরা আপনার সিদ্ধান্তে মেনে নিব। একথা বলার পর তিনি হযরত উসমান (রাঃ) কে খলীফা নির্বাচন করেন। সাহাবাদের সামনে তিনি তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর সকল সাহাবা বাইআত গ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর এক সময় ওনাকে শহীদ করে দেয়া হয়। ফলে তিনি আর কাউকে খলীফা নিযুক্ত করার সুযোগ পাননি। তাই মোহাজের এবং আনসারী সাহাবীদের উপদেষ্টা পরিষদ হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। আসলে এ রকম হওয়ারই প্রয়োজন ছিল। কারণ সে সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত আলীই (রাঃ) সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন।

খোলাফাদের শাসনকাল

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় কাল হলো দুই বছর তিন মাস। হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় কাল হলো সাড়ে দশ বছর। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় কাল হলো বার বছর। আর হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের সময়কাল হলো চার বছর নয় মাস, আর হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) এর খেলাফত এর সময়কাল হলো ছয়মাস। এরপর তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সাথে আপষ করে নেন। এভাবে খেলাফতের মোট সময় হলো ত্রিশ বছর। এটিই হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মোট সময়কাল। এরপর গভর্ণর এবং রাজত্বের যুগ শুরু হয়ে যায়। এ হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি) মুসলমানদের সর্বপ্রথম বাদশাহ এবং সকল মুসলিম বাদশাহগণের মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট। মোট কথা এরা চারজন এমন ব্যক্তিত্ব যাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়েছে এবং ওদের অনুকরণের জন্য আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

উপরন্ত দশজন সাহাবা এমন আছে যাদের সম্পর্কে নবীজী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তার কথায় আমরা তাদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার সাক্ষী দিচ্ছি। ঐ দশ জনের মধ্যে চারজন তো খোলাফায়ে রাশেদীন। তাছাড়া হযরত তালহা, যুবাইর, সা'দ, সাঈদ। আব্দুর রহমান এবং ওবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) ও রয়েছেন।

মোট কথা যারা সাহাবাদেরকে মহব্বত করবে। তাদের সুআলোচনা করবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণ এবং পরিবার বর্গের সুআলোচনা করবে, তারা নেফাক মুক্ত থাকবে। আর যারা তাদের সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা রাখবে তাদেরকে গাল মন্দ এবং সমালোচনার টার্গেট বানাবে তারা তাদের ঈমানের শত্রু হবে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا لِأَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَفْضِيْلًا لَهُ وَتَقْدِيْمًا لَهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّوْنَ وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلٰى مَاشَهِدَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَبُوْعُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُمْ أُمَنَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِىْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ -

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) এর জন্য খেলাফতকে স্বীকার করি। সকল উম্মতের উপর তাকে প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকার দিই। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) এর জন্য খেলাফতকে এর পর হযরত ওসমানের জন্য এরপর হযরত আলীর জন্য স্বীকার করি। এরা সকলে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হেদায়াত প্রাপ্ত ইমাম। আর যে দশ জনের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে আমরা জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিই। কারণ তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী হওয়ার সাক্ষী দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তার কথা সত্য। উক্ত ব্যক্তিরা হলেন– হযরত আবু বকর -উমর-উসমান-আলী-তালহা-যুবাইর, সাদ, সাঈদ আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু ওবাইদা বিন জাররাহ এরা সবাই এই উম্মতের বিশ্বস্ত লোক। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি সম্পর্কে সু আলোচনা করবে তারা নেফাক থেকে মুক্ত থাকবে।

অযথা আলেমদের দুর্নাম করা কুফরী

এছাড়া পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণ চাই মুহাদ্দেছ হোক অথবা ফকীহ তাদের সু আলোচনা করতে হবে। যারা আলেমদের দুর্নাম করবে না তারা সৎ পথে থাকবে কারণ আলেম আলেম হওয়া হিসেবে তাদের দুর্নাম করা কুফরী।

কোরআনের মূল পাঠ দ্বারা সকল মুমিনের মহব্বত আবশ্যক হওয়াটা প্রমাণিত, সুতরাং আলেমদের মহব্বত কেন আবশ্যক হবেনা। নবীদের উত্তরসুরী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আলেমরাই। কোরআন এবং হাদীসে তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ الصَّالِحِينَ السَّابِقِينَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَايَذْكُرُونَ إِلَّابِا الْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ فَهُوَ عَلٰى غَيْرِ السَّبِيلِ۔

পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা সৎ অর্থাৎ সাহাবা এবং তাবেঈন এবং যারা তাদের পরে এসেছেন অর্থাৎ যারা কোরআন হাদীস ফিকহের পারদর্শী এবং গবেষক, তাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করতে হবে। আর যারা তাদেরকে অসৎভাবে স্মরণ করবে তারা পথভ্রষ্ট।

জ্ঞাতব্য ঃ বর্তমানে যারা আলেমদের সমালোচনাকে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে বেছে নিয়েছে, তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় দিক থেকে ক্ষতির সম্মুখিন। তবে আলেমদের মধ্যে কিছু যে মন্দ আছে একথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সত্যের সন্ধান করা জরুরী। যেসব আলেম সুন্নাতের অনুসারী তাদেরকে অনুকরণ করে চলতে হবে।

একজন নবী সমস্ত ওলীর চেয়ে ও উত্তম

কিছু কিছু লোকের মাথায় ভূত ঢুকেছে, তারা বলে বেলায়াতের স্তর নবুওয়্যতের স্তরের উপরে বরং নবুওয়্যতের স্তর বেলায়াতের স্তরের উর্দ্ধে। কোন ওয়ালী নবীর স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারেনা। বরং আমরা বলি একজন নবী দুনিয়ার সমস্ত ওলীর চেয়েও উত্তম। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَانُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْأَوْلِيَاءِ-

আমরা ওলীদেরক নবীদের উপর প্রধান্য দিইনা, বরং আমরা বলি একজন নবী সমস্ত ওলির চেয়ে উত্তম।

ওয়ালীদের কেরামাত সত্য

কোরআন হাদীস এবং সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনায় ওলীদের কেরামতের অনেক কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আমরা ওলীদের কেরামতকে সত্য মনে করি। অনেক লোক না বুঝার কারণে ওলীদের কেরামতকে অস্বীকার করে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন-

وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ

আমরা ঐ সকল অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস করি, যা ওলীদের থেকে কেরামত হিসেবে সংঘটিত হয় এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনা কারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত উমর (রাঃ) এর কেরামতের কথা কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত উমর (রাঃ) এর চিঠির বরকতে নিল নদে পানি চালু হয়ে যাওয়া এবং নাহাবন্দ নামক জায়গায় নিজের সৈন্যদেরকে দেখা এবং পরে ইয়া সারেয়াতুল জাবাল বলা আর সৈন্যরা উক্ত আওয়াজটি শোনা ইতিহাসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য রয়েছে।

কেয়ামতের কয়েকটি নিদর্শন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু জিনিসকে কেয়ামতের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। নিদর্শন গুলো একটি হাদীসে উল্লেখ আছে তাহল এই-

(১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ (৩) একটি বিশেষ জন্তুর আত্মপ্রকাশ। (৪) পশ্চিম দিক হতে সূর্যের উদয়। (৫) ঈসা (আঃ) এর অবতরণ (৬) ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ। (৭) তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ১টি পূর্বে আর একটি পশ্চিমে আরেকটি আরব দ্বীপে (৮) এমন আগুনের প্রকাশ যা মানুষকে কেয়ামতের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। উপরোক্ত সকল কথাকে আমরা বিশ্বাস করি। এখানে লেখক পাচঁটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। (১) দাজ্জালোর আত্মপ্রকাশ (২) হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমান থেকে অবতরণ এবং দাজ্জালকে হত্যা করা এবং ইমাম মাহদীর অনুকরণ করা। (৩) সেকান্দর যুল কারনাইন যে লৌহ প্রাচীর দিয়ে ইয়াজুজ মাজুজের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন তা ভেঙ্গে তাদের বহির্গমন এবং পৃথিবীতে তাদের বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। এরপর আল্লাহ তায়ালার দেয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়া। (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া যারপর কোন কাফের বা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। ৫। সাফা নামক পাহাড় ফেটে একটি চতুষ্পদ জন্তু বের হওয়া, যেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُوْلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ وَخُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا

আর আমরা কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর অর্থাৎ, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ। আসমান থেকে ঈসা (আঃ) এর অবতরণ। ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। অনুরূপ আমরা সূর্য স্তিমিত হওয়ার জায়গা হতে উদিত হওয়ার উপর এবং জমিন থেকে একটি জন্তু বের হওয়ার উপর ও বিশ্বাস স্থাপন করি।

জ্যোতিষী এবং শরীয়ত বিরোধীকে বিশ্বাস করা বৈধ নয়

আমাদের বিশ্বাস হলো অদৃশ্য বিষয়াবলী জানা আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ, সে সম্পর্কে কেউ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। যদি কোন গনক বা জ্যোতিষী অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়, তবে আমরা তা বিশ্বাস করবোনা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোরআন হাদীস এবং উম্মতের ঐক্যমতের বিরুদ্ধে কোনকিছু দাবী করবে, তার কথা আমরা বিশ্বাস

করবো না। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ

আমরা কোন জ্যোতিষী কোন গণক এবং এমন কোন ব্যক্তি যে কোরআন সুন্নাহ বা উম্মতের ঐক্যমতের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে বিশ্বাস করবনা।

এছাড়া আমাদের আক্বীদা হলো, সাহাবা তাবেঈন এবং হক্বপন্থী আলেমদের অনুসরণ করা এরাই সত্য। আর তাদের অনুসরণ সত্যের অনুসরণ। আমরা সত্যের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গোমরাহী এবং শাস্তি মনে করি। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার মনোনিত ধর্ম হলো ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি উভয়ের মালিক এবং উভয় স্থানে তিনিই উপাস্য। সুতরাং বুঝা গেল জমিন এবং আসমানে তার ধর্ম হল ইসলাম। একথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا وَدِيْنُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِيْنُ الْإِسْلَامِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ وَقَالَ تَعَالٰى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

আমরা একতাবদ্ধতাকে সত্য এবং সঠিক মনে করি। আর এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গোমরাহী এবং আযাব মনে করি। জমিন-আসমানে আল্লাহ তায়ালার ধর্ম একটি আর তাহলো ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনিত ধর্ম একমাত্র ইসলাম। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের ধর্ম ইসলাম হওয়ায় আমি তোমাদের উপর রাজী হয়ে গেছি।

ব্যাখ্যা ঃ কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীস দ্বারা ধর্ম এক হওয়াটা বুঝে আসে। এছাড়া অসংখ্য আয়াত এবং হাদীসে ঐক্য এবং একতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে? অনৈক্যের ব্যাপারে ধমক দেয়া হয়েছে। এখানে অনৈক্য বলতে উহাকে বুঝানো হয়েছে যা আত্মতুষ্টির জন্য করা হয়।

অষ্টাদশ পাঠ

ইসলাম একটি সহজ সরল মতাদর্শ

দেখতে গেলে একমাত্র ইসলামই একটি পরিপূর্ণ এবং সামঞ্জস্য পূর্ণ ধর্ম। এতে কোন ধরনের বাড়া বাড়ি নেই। মূসা (আঃ)-এর দ্বীনের মত অতিরঞ্জন ও নেই। ঈসা (আঃ)-এর দ্বীনের মত অতিরিক্ত ছাড়ও নেই। যদি আপনি দেখতে চান বিভিন্ন দলের মধ্য প্রকৃত দ্বীনের উপর কারা আছে। তাহলে দেখতে পাবেন যে, খাঁটি দল তারাই যাদের মধ্যে সাম স্যতা রয়েছে, যাদের মধ্যে কোন ধরণের সীমা লঙ্ঘন নেই। তারা সন্যাসী পন্থাও অবলম্বন করে না, হালালকে হারামও বলে না। আবার সম্পূর্ণ এমন চতুষ্পদ জন্তুর মত ও নয় যাদের মধ্যে হারাম হালালের কোন ভেদাভেদ নেই। প্রথমটি হলো সীমালঙ্গন দ্বিতীয়টি লাগামহীনতা।

কিছু কিছু লোক আল্লাহ তায়ালা এবং তার গুণাবলীকে মাখলুকের সত্তা এবং গুণাবলীর সাথে তুলনা করে, ওদেরকে মুশাবেবহা বলা হয়। আমরা ঐ মতাদর্শকেও বাতিল মনে করি। আর একটি দল আছে যারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীকে অস্বীকার করে, ওদেরকে মুআত্তেলা বলা হয়।

মোট কথা হক পন্থিদের মধ্যে কোন ধরণের তুলনা করা বা গুণাবলীর অস্বীকার করা নেই। আরেকটি দল হল জাবারিয়া। এরা মানুষকে একান্ত বাধ্য মনে করে। আরেকটি দল হল কদরিয়া এরা বান্দাকে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। কিন্তু উভয় ধারণা ভুল। সত্য কথা হলো, বান্দা একান্ত বাধ্যও নয় আবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ও নয় বরং কিছু-কিছু কাজ করার ক্ষমতা তার আছে, আর কিছু-কিছু কাজ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। এছাড়া আমাদের আকিদা হলো, মানুষ আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে সম্পূর্ণ নির্ভয় নয়, আবার তার রহমত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশও নয়। বরং আশা নিরাশার মাঝামাঝিতে থাকে। এ কথাটি ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْاَمْنِ وَالْيَاسِ فَهٰذَا دِيْنُنَا وَاِعْتِقَادُنَا

ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ.

আর উহা (ইসলাম ধর্ম) সীমালঙ্ঘন এবং উদাহরণ তুলনা এবং গুণাবলীর অস্বীকার এবং বান্দাকে একান্ত বাধ্য বলা পূর্ণ ক্ষমতাধারী বলা, নিশ্চিন্তে থাকা বা হতাশায় ভুগা ইত্যাদির মধ্যবর্তী। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ইহাই আমাদের ধর্ম এবং বিশ্বাস। উপরোল্লেখিত কথার যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক গোমরাহ দলের উপর আমরা অসন্তুষ্ট। যা আমরা বর্ণনা করেছি তাই আমাদের বিশ্বাস আর উহাই হক্ব পন্থিদের মতাদর্শ। যার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি এবং ছাড় নেই। বরং পুরোপুরি সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

গ্রন্থকারের শেষ কথা

কিতাবের সমাপ্তিতে লেখক আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করছেন যে, আপনি আমাদের মৃত্যু ঈমানের উপর করুন এবং আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের উপর অটল রাখুন। কুপ্রবৃত্তি বিভিন্ন মতবাদ এবং বাজে মতাদর্শ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুণ। যেমন নাকি মুশাব্বেহা, মুয়াত্বেলা, জাহামিয়া, জবরিয়া, কদরিয়া ইত্যাদি জামাত রয়েছে, যারা সুন্নাতের বিরুদ্ধে চলে এবং গোমরাহীর সাথী। এরা সকলে গোমরাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন যে, আমার উম্মত তেহত্তর দলে বিভক্ত হবে, বাস্তবেই দেখা গেছে তারা তেহত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতরাই হক পন্থি। আমরা গোমরাহ দলগুলোকে ঘৃণা করি এবং তাদেরকে গোমরাহ মনে করি। তাদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করি। কারণ আল্লাহর তওফীক ছাড়া কোন কিছুই হয় না। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন,

وَنَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُّثَبِّتَنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهٖ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْاَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ

الرَّدِيَّةِ مِثْلُ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الَّذِيْنَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَخَالَفُوا الضَّلَالَةَ وَنَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُمْ وَهُمْ عِنْدَ نَا ضُلَالٌ اَرْدِيَاءُ وَبِاللّٰهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيْقُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

আর আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট এ আবেদন করছি যে, আপনি আমাদেরকে ঈমানের উপর অটল রাখুন। আমাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে করুন। আমাদেরকে মনোবৃত্তি-বিভিন্ন-চিন্তাধারা বাজে মতাদর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। যেমন– মুশাব্বেহা, মুতেজালা, জাহামিয়া, জবরিয়া, কদরিয়া প্রমুখ জামাত এবং ঐ সকল জামাতা যারা আহলে সুন্নাতের বিরোধী এবং গোমরাহীর সাথী হয়ে আছে। আমরা এদের থেকে মুক্ত। এরা আমাদের নিকট গোমরাহ নিকৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালার নিকটই আমরা রক্ষা এবং তওফীক চাচ্ছি। হে আল্লাহ আপনি রহমত এবং শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবার বর্গ এবং সাহাবাদের উপর। সকল প্রশংসা বিশ্ব পালনকর্তারই জন্যে।

ব্যাখ্যা ঃ (১) মুশাববেহা ঃ এ দলটি খৃষ্টানদের মতই। খৃষ্টানরা যেমন হযরত ঈসাকে আল্লাহ তায়ালার সাথে তুলনা করে তেমনি এরাও আল্লাহ তায়ালা এবং তার গুণাবলীকে মাখলুকের সত্তা এবং গুণাবলীর সাথে তুলনা করে।

(২) **মুতেজালা** ঃ এ দলটি আমর বিন ওবাইদ এবং ওয়াসেল বিন আতা আল গাজ্জালী এবং তাদের সাথীদের সংঘবদ্ধ নাম। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে হযরত হাসান বাসারী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে আলাদা হয়ে যায় এ জন্য এদেরকে মুতেজালা বলা হয়।

৩। **জাহামিয়া** ঃ জাহাম বিন সফওয়ান সমরকন্দীর দিকে ইঙ্গিত করে এ দলটিকে জাহামিয়া বলা হয়। এই জাহাম নামক লোকটি সেই জাহাম

যে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে। আর সে এ শিক্ষাটি জাদ বিনদেরহাম থেকে নিয়েছে। যাকে খালেদ বিন আব্দুল্লাহ কছরী জবাই করে দিয়েছিল। আর তিনি এ কাজটি তখনকার আলেমদের ফৎওয়া নিয়েই করেছিলেন।

৪। **জাবারিয়া ও কদরিয়া ঃ** এদের সম্পর্কে আমি প্রথমে বলেছি, প্রথম দলটি মানুষকে একান্ত বাধ্য মনে করে, আর দ্বিতীয় দলটি মানুষকে স্বীয় ক্রিয়ার স্রষ্টা মনে করে।

যতটি গোমরাহদল সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সবার মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা রয়েছে। তাদের কাছে জাতিকে গোমরাহ করার বিভিন্ন হাতিয়ার রয়েছে। হাফেজ ইবনুল জাওযী (রহঃ) এর "তাল্‌বীসে ইবলিস" নামক গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি চমৎকার গ্রন্থ।

আলহামদুলিল্লাহ ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) এর আকীদাতুত ত্বাহাবী নামক গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহঃ) আকীদাতুত ত্বাহাবীর খুব সুন্দর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি কিতাবের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা সংযোজন করেছেন। নিম্নে তা দেয়া হলো।

আকীদাতুত ত্বাহাবী সমাপ্ত

উনবিংশ পাঠ

খেলাফতের আলোচনা

ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) স্বীয় কিতাবে খেলাফত নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যে সব কথা বর্ণনা করার মত ছিল তা বর্ণনা করেছেন। হাকীমুল ইসলাম ক্বারী তৈয়ব সাহেব (রহঃ) এই মনে করে যে, খেলাফতের কিছু দাবী দাওয়া এবং উদ্দেশ্য রয়েছে।তিনি পাঠকদের উপকারার্থে কিতাবের শেষে খেলাফতের দাবী এবং উদ্দেশ্য সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَبَانِى الْخِلَافَةِ وَالسِّيَاسَةِ الدِّيْنِيَّةِ وَغَايَاتُهَا (من حكيم الاسلام رح)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খেলাফত এবং ধর্মীয় রাজনীতি এবং খেলাফতের উদ্দেশ্য।

খেলাফত কি ও কেন?

ইসলামী বিষয়াবলীর মধ্যে খেলাফত ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক ইবাদত অনেক লেন-দেন এবং আহকাম এই খেলাফতের উপর নির্ভরশীল।

এখানে খেলাফত তথা ধর্মীয় রাজনীতির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন রাজনীতি যদ্দারা মানুষ পার্থিব এবং ধর্মীয় ক্ষতি থেকে নিজে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। সাধারণত শরীয়ত বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় রাজনীতির প্রতি খেয়াল রেখেছে। যেমন ধরুন জুমার খুতবা আরবীতে পড়ার অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ হল, সাধারণ মানুষের মধ্যে আরবী ভাষার গুরুত্ব এবং তার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। যাতে তাদের জন্য কোরআন হাদীস বুঝা সহজ হয়। অনুরূপ একদিকে পিতাকে বলা হয়েছে যে, আপনার উপর সন্তানের এই-এই হক, আর সন্তানকে বলা হয়েছে "পিতা মাতাকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। স্বামীকে বলা হয়েছে তোমার উপর স্ত্রীর হক্ব রয়েছে, তা তুমি আদায় কর আর স্ত্রীকে বলা হয়েছে স্বামীর আনুগত্য কর। কারণ তার অনেক মর্যাদা রয়েছে। উপরোক্ত কথাগুলো ধর্মীয় রাজনীতির সামান্য আলোকচ্ছটা মাত্র এর মধ্যে অনেক মঙ্গল এবং রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং খেলাফতের মধ্যে আরো যখন মঙ্গল নিহিত আছে তাই এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, সমস্ত উম্মত ইসলামের দায়িত্বশীল। আবার এ কথাও স্বত সিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি সাহাবা তাবেঈন এবং পূর্ববর্তী নেক লোকদেরকে ত্যাগ করে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হলো, ইসলমের জন্য জামাতের প্রয়োজন আছে আর জামাতের জন্য ইমাম এবং নেতার প্রয়োজন আছে। কারণ যে জামাতের কোন ইমাম বা নেতা থাকে না সে জামাত কোন জামাতই নয়। আবার ইমামও এমন হওয়া উচিত যার কথা সবাই শুনবে, সবাই তার আনুগত্য করবে, তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য মনে করবে। কিন্তু এখানে একটা কথা লক্ষণীয় যে, আনুগত্য করা তখনই সম্ভব যখন এমন কোন অকাট্য আইন পাওয়া যাবে যার আলোতে আনুগত্য করা যায়। আর অকাট্য আইন উহাই যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এ ধরণের অকাট্য আইন সাধারণত দুনিয়া থেকে ফেৎনা-ফাসাদ দূর করে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। যাতে মানুষ মন খুলে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে পারে, যদি এধরনের আইন জারি করা যায় তাহলে তো ভাল। আর যদি জারি করতে কোন সমস্যা হয়, তবে কখনো হিজরত করতে হয়, কখনো জেহাদ করতে হয়। অর্থাৎ আইনের বিরোধিতাকারী যদি ক্ষমতাশালী এবং শক্তিশালী হয়, যার সাথে মোকাবেলা করে কুলিয়ে উঠা সম্ভব নয়, তখন ঈমান বাঁচানোর জন্য হিজরত করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি আইনের বিরোধিতাকারী এমন শক্তিশালী না হয় যার সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়, তবে এমতাবস্থায় একান্ত অপারগতা বশতঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের সাথে মোকাবেলা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ জেহাদ করতে হয়। জেহাদ শরীয়তের এমন একটি বিধান যাকে কেউ রহিত করতে পারবে না। এটি কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

জাতির জন্য একজন পরিচালক দরকার

উল্লেখিত সকল বিষয় ধর্মীয় রাজনীতির মূলভিত্তি এবং মূলনীতি। মোট কথা লেখক (রহঃ) খেলাফতের ভিত্তি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বর্ণনাটি দিয়েছেন। তাতে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জাতির জন্য এক জন পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক থাকা দরকার। তবে প্রশ্ন হলো পরিচালকরা তত্ত্বধায়ক কাকে নিয়োগ করবে কে? কি আসমান থেকে ইমাম অবতরণ করবে? এটি তো অসম্ভব। সুতরাং প্রয়োজন হলো যারা উপস্থিত আছে তাদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচন করা। এখন নির্বাচন করবে কে? নির্বাচন করবে লোকদের মধ্যে যারা সার্বিক চিন্তার অধিকারী তারাই। লেখক বলেন,

وَمِنْ اِقْتِضَاءِ الْخِلَافَةِ الْاِسْتِخْلَافُ وَهُوَ نَصْبُ الْإِمَامِ عَلٰى كُلِّ

حَالٍ حَسَبَ الْاِسْتِطَاعَةِ لِئَلَّا يَبْقَى الْقَوْمُ فَوْضَى

খেলাফতের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী থেকে একটি হলো খলীফা বানানো। আসলে এটি সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় ইমাম নিয়োগ করারই নাম। যাতে জাতি ইমাম বিহীন না থাকে।

পরিচালক কেমন হওয়া চাই

খেলাফতের এ প্রয়োজনটি মিটানোর অর্থ এ নয় যে, আজে-বাজে যে কোন লোককে ইমাম বা নেতা বানিয়ে নিবে। এ ধরনের কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অত্যাচার। বরং এখানে প্রয়োজন হলো, এমন একজন লোককে নির্বাচিত করা যে তার যোগ্যতা বলে খেলাফতের দায়িত্ব নেয়ার উপযুক্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কে তার এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে, যদ্দারা সে দেশে শৃংখলা বজায় রাখতে এবং শত্রুদের মোকাবেলা করতে, মুসলিম দেশের সীমান্তগুলো রক্ষা করতে সক্ষম। যদি বাদশার মধ্যে উক্ত গুণগুলো না থাকে। যেমন তার মধ্যে জ্ঞান, চিন্তাধারা ঘটনা বুঝার যোগ্যতা অবস্থা বিবেচনার শক্তি ইত্যাদি না থাকে তবে এ রকম লোক ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। উক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, খেলাফতের দায়িত্ব উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে হয়না বরং নির্বাচনের মাধ্যমেই হয়।

এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত, অনেক সময় এ রকমও হয় যে, একটি লোক সৎ, ধর্মীয় জ্ঞানের পণ্ডিত কিন্তু ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা রাখে না। আর অন্য এক লোক ঐ পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী না হলেও, শৃংখলার বিষয় গুলোর ব্যাপারে খুব পারদর্শী, অবস্থার উঁচ নীচ সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা রাখে। এমতাবস্থায় ঐ লোকটিকে নির্বাচিত করা উত্তম হবে যে, ইলমের সাথে-সাথে স্বীয় পরিচালনার গুণের কারণে মুসলমানদের বেশী খেদমত করতে পারবে। এ কথাটি লেখক বলেন,

وَانْتِخَابُ الْاَصْلَحِ بِمِعْيَارِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ

খেলাফতের বিষয়াবলীর মধ্যে আরেকটি হলো, জ্ঞান এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দিক থেকে যে বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন তাকে নির্বাচন করা।

যে নিজে প্রার্থী হয় তাকে কি নেতা বানানো যাবে?

পূর্বে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনের ভিত্তি জন কল্যানের উপর। আর জন কল্যাণ এমন লোক নিয়োগ করার মধ্যেই নিহিত, যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি নিজে আগে বেড়ে মানুষের কাছে আমীর হওয়ার আবেদন করে তখন কি করা চাই? বাহ্যত এ ধরনের আবেদনে যেহেতু

নিজের স্বার্থ লুকায়িত থাকে আবার লোকটিও অভিযুক্ত থাকে তাই তাকে নির্বাচিত করা ঠিক নয়। বরং যার মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে তাকে নির্বাচিত করা দরকার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় এবং এর প্রার্থী হয়। তাকে তা দেয়া যাবে না। তবে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব অথবা কোন পদ শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং জন কল্যাণের জন্য চায়, লোকজনও তার নিষ্ঠা-সততা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে তাকে নির্বাচিত করতে কোন অসুবিধা নেই। বরং সে যদি অন্যান্যদের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার বেশী উপযুক্ত হয়, তবে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন– হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাদশার নিকট তাকে অর্থমন্ত্রী বানানোর আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং জন কল্যাণই ছিল এ আবেদনের মূলভিত্তি। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কি পরিমাণ জ্ঞান দান করেছিলেন এবং দেশ সংরক্ষণের জন্য কি ধরণের যোগ্যতা দান করেছিলেন, তা সবাই জানে। তার দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারনে মানুষ দুর্ভিক্ষের সময়গুলোতে দুঃখ-কষ্ট থেকে বেঁচে ছিলেন।

মোট কথা তিনি এ কাজের যেমন যোগ্য ছিলেন তেমনি গভীর চিন্তার অধিকারীও ছিলেন। সাথে-সাথে লোকজনও তার নিষ্ঠা সততা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এ কথাটি লেখক বলেন,

وَتَفْوِيْضُ الْأَمْرِ إِلٰى مَنْ لَا يَبْتَغِيْهِ إِلَّا مَنْ يَطْلُبُهُ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَالنَّاسُ يَعْرِفُوْنَ بِصِدْقِهِ وَإِخْلَاصِهِ -

খেলাফতের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর মধ্যে আর একটি হলো, শাসন ভার এমন ব্যক্তিকে দেয়া যে নিজে প্রার্থী হয় না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তা চায় এবং তার সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে মানুষও জানে, তবে তাকে শাসনভার দিতে কোন অসুবিধা নেই।

পরিচালকের জন্য কি পরামর্শ জরুরী?

একজন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে যখন নির্বাচিত করা হবে, তখন তাঁর উচিত হলো, বিচক্ষণ এবং বিবেকবান লোকদের সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ করা। কারণ মানুষের মধ্যে স্বভাবত ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে। পরামর্শের মধ্যে যেহেতু কল্যাণ নিহিত এবং এর মাধ্যমে সত্যকে সন্ধান করা যায়, তাই এর অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি পরামর্শ না করে ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন ও জারি করা হয় তবে তাকে একনায়কতন্ত্র এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করণ বলা হবে। এটি ইসলামী মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইমামকে পরস্পর পরামর্শ করতে বলা

হয়েছে। পরামর্শ করতে গিয়ে যদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তবে ইমামের অধিকার আছে যেকোন একটি মতকে ইসলামী বিধানের আলোকে প্রাধান্য দিয়ে তার উপর আমল করা। কারণ পরামর্শ না করলে তা একনায়কতন্ত্র হবে যা ঘৃণিত। এমতবস্থায় প্রাধান্য দেয়ার অধিকার যদি তার না থাকে তবে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে যা ইমাম নির্বাচনের পরিপন্থি। সুতরাং প্রাধান্য দেয়ার অধিকার তার থাকবে। এ কথাটি তিনি বলেন,

وَيَلْزَمُهُ الشُّوْرٰى لِدَفْعِ الْإِسْتِبْدَادِ وَعَلَيْهِ الْعَزِيْمَةُ وَالتَّرْجِيْحُ لِدَفْعِ الْإِنْتِشَارِ وَالْفَوْضَوِيَّةِ

একনায়কতন্ত্রকে খতম করার জন্য ইমামের জন্য পরামর্শ করা জরুরী। আর গন্ডগোল এবং বিশৃংখলা দূর করার জন্য দৃঢ় সংকল্প এবং কোন একটি মতকে প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক।

খেলাফতের জন্য একটি আইন প্রয়োজন

খেলাফতের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর আরেকটি হলো, একটি অকাট্য আইন। যাকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন বিধি-নিষেধ জারি করবে। এখানে অকাট্য আইন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোরআন-হাদীস উম্মতের ঐক্যমত এবং মুজতাহিদদের কোরআন হাদীস ভিত্তিক মতামত। মোট কথা খেলাফতের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর ভেতরে অকাট্য আইন এবং ন্যায় ফয়সলাও অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত এখানেও ধর্মীয় রাজনীতিকে ব্যবহার করেছে। ইমামকে বলা হয়েছে বিধি-বিধান জারি করার সময় ন্যায়ের প্রতি লক্ষ রাখবে। আর লোকদেরকে বলা হয়েছে ইমামের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। চাই হুকুম মনপুত হোক বা নাই হোক। সর্বাবস্থায় আনুগত্য করবে। তবে শর্ত হলো আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর হুকুম না হওয়া। কেননা যদি আল্লাহ তায়ালার নাফররমানীর হুকুম করা হয় তবে আনুগত্য করা বৈধ নয়। এ কথাটি তিনি বলেন,

وَالْقَانُوْنُ الْقَطْعِي لِلتَّمَسُّكِ وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَلَوْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى الْقَوْمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلٰى مَنْشَطٍ وَمَكْرَهٍ إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

এবং (খেলাফতের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর মধ্য থেকে) মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য যেকোন একটি অকাট্য আইনের প্রয়োজন রয়েছে। আর ন্যায় ফায়সলা করারও প্রয়োজন আছে। যদিও ফায়সলা নিজের বিরুদ্ধে হয়। আর

সাধারণ লোকদের জন্য রাজি অরাজি সর্বাবস্থায় তার আনুগত্য করা অপরিহার্য, যদি সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর হুকুম না দেয়।

জনগণের দায়িত্ব কি?

জ্ঞাতব্য ঃ হুকুম মনপুতঃ হোক বা নাই হোক সর্বাবস্থায় মানতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় ন্যায় সিদ্ধান্ত নিজের বিরুদ্ধে হলেও তা মানতে হবে। সাহাবারা হযরত উসামার মাধ্যমে নবী দরবারে এক চোরনীর জন্য চোরীর শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করালে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করে, তবে তার হাতও কেটে দেয়া হবে।

পরিচালকের দায়িত্ব কি?

কাউকে ইমাম নিযুক্ত করার পর তিনি চুপ করে বসে থাকবেন না। বরং নিজের দায়িত্বগুলো পালন করবে। তাঁর কর্তব্য হলো নিজের সাধ্যমত শত্রুদের এবং বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ফৌজ তৈরী করা সীমান্ত রক্ষা করা, যাতে কাফেররা আক্রমণ করতে না পারে। দুশমনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ -

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার। নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না।

এ ছাড়া কাফেরদেরকে সত্যের আহবান জানাবে। যদি তারা কবুল করে তাহলে তো ভাল, নতুবা তাদেরকে কর আদায় করতে বলবে। কর দিতে রাজি হয়ে গেলে ভাল। কিন্তু এই দুইটি থেকে কোনটি যদি কবুল না করে, তবে তাদের সাথে জেহাদ করতে হবে। জেহাদ সত্তাগত ভাবে ভাল নয়। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার মাখলুককে ধ্বংস করা হয়। তবে এটি অন্য দিক থেকে ভাল। কারণ জেহাদের উদ্দেশ্য হল– আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে বুলন্দ করা এবং ক্ষতিকর জিনিসকে দূর করা দেয়া। যাতে সেগুলোর কু প্রভাব অন্যদের উপর না পড়ে। তিনি বলেন,

وَيَلْزَمُهُ الْإِعْدَادُ الْمُسْتَطَاعُ لِلْحِفْظِ وَسَدِّ الثُّغُوْرِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ

আত্ম রক্ষার জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা ইমামের জন্য অপরিহার্য। আর ফেৎনা দূর করার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যা ঃ এখান থেকে এ কথাটি পরিস্কার হয়ে গেল যে, জেহাদের পূর্বে দাওয়াত দেয়া জরুরী। যাতে তারা জানতে পারে যে, আমাদের সাথে যে যুদ্ধটি করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য জান মালের ক্ষতি করা নয়, বরং দ্বীনের তাবলীগ করা।

অনুরূপ ভাবে ইমামের প্রয়োজন হল, যে হিজরত করতে চায় তার হিজরতের ব্যবস্থা করা। চাই জায়গার হিজরত হোক বা আত্মিক হিজরত হোক। জায়গার হিজরত যেমন অমুসলিম দেশে যদি ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়। তখন সেখান থেকে ইসলামী দেশে হিজরত করা। আর এ ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব হলো হিজরত সহজ হওয়ার ব্যাস্থা করা। আর আত্মিক হিজরত হলো, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং নির্দেশিত জিনিসগুলো আকড়ে ধরা। এ ক্ষেত্রে ইমামের উচিত হল সহজতার দিকে লক্ষ রাখা। যেমন তারা যদি হক পন্থী আলেম এবং সুফী অথবা বিচারক হয়, সরকারী কোষাগার থেকে তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা। এ কথাটি তিনি বলেন,

وَالتَّيْسِيْرُ لِلْهِجْرَةِ لِمَنْ يُهَاجِرُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَكَانِيَةً كَانَتْ اَوْمَعْنَوِيَّةً

যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে, চাই জায়গার হিজরত হোক বা আত্মিক হিজরত হোক। তার হিজরতের জন্য সুব্যবস্থা করা।

এ ছাড়া ইমামের দায়িত্ব হলো, লোকজনের প্রতি লক্ষ রাখা যাতে তারা সচেতন থাকে, উদাসীন বা গাফেল না হয়। যদি শাস্তি বা শিষ্টাচার শেখানোর প্রয়োজন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে শীথীলতা না করা। এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবুবকর (রঃ) এবং হযরত উমরের (রঃ) অনুকরণ করা আবশ্যক এরা রাতের বেলায় এবং দিনের বেলায় লোকজনের খবর রাখতেন। রাতের বেলায় লোকজন যখন শুয়ে পড়ত তখন হযরত উমর (রাঃ) তাদের অবস্থা জানার জন্য বস্তিতে-জঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় চক্কর দিতেন। অর্থাৎ কেউ কোন দুঃখে আছে কিনা, শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য ঘুরাফেরা করতেন। মোট কথা ইমামের দায়িত্ব হলো, নিজে সচেতন এবং চৌকস থাকা মানুষকেও চৌকস রাখা। এ কথাটি তিনি বলেন,

وَالْاِحْتِسَابُ لِلْاَيْقَاظِ وَالْمُوَاخَذَةِ

মানুষকে সচেতন বানানোর জন্য ইমামের প্রয়োজন হল তাদের দেখাশোনা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও করা।

জ্ঞাতব্য ঃ তবে এই দেখাশোনার উদ্দেশ্য হল সংশোধন করা বিশৃংখলা সৃষ্টি নয়। আল্লাহ তায়ালা অন্তরের খবর ভালই জানেন।

খেলাফতের উদ্দেশ্যসমূহ

১। দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা

খেলাফতের প্রথম উদ্দেশ্য হল, ধর্মকে রক্ষা করা এবং তার উপর আমল করা। যেমন নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি। এ জন্য কোরআনে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।

এ আয়াতে নিপীড়িত মুসলমানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। (তারা হলেন মুহাজের) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করবেন না কেন? যখন নাকি তারা এমন একটি জাতি যে, তাদেরকে যদি পৃথিবীর রাজত্ব দেয়া হয়, তার পরও তারা আল্লাহ তায়ালা থেকে বিমুখ হবে না। জান মাল নিয়ে সৎ কাজে লেগে থাকবে এবং অন্যদেরকেও এ পথে আনার চেষ্টা করবে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন। ফলে পূর্বে যে সব কথা বলা হয়েছে সবগুলো তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। এ আয়াত দ্বারা যেমন সাহাবাদের বিশেষত মুহাজেরদের এবং তাদের মধ্য বিশেষ করে খলিফাদের সততা-গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদা প্রমাণিত হয়, তেমনি এর দ্বারা খেলাফতের উদ্দেশ্য ও জানা যায়। এ হিসেবে যে, খেলাফতের মূল লক্ষ হল– দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়ন করা। কথা যখন তাই হল, সুতরাং ইমামের জন্য প্রয়োজন হল খেলাফতের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য ফরজ ওয়াজেব-সুন্নাত এবং ইসলামী আইন কানুনের পুরোপুরি খেয়াল রাখা এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। চাই উক্ত কাজগুলোর সম্পর্ক ইবাদতের সাথে হোক বা লেনদেনের সাথে বা সামাজিক কর্ম কান্ডের সাথে।

মোট কথা, সমস্ত কাজে শরয়ী কানুনের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। উম্মতের দায়িত্ব হল, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা। আর এর জন্য প্রয়োজন হল, মজবুত শক্তির। খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তি পাকা

পুক্ত হয়, সুতরাং এই দায়িত্বটি পালন করা খুব জরুরী। এ কথাটি তিনি বলেন,

وَغَايَتُهَا إِقَامَةُ الدِّيْنِ وَحِفْظُ الْحُدُوْدِفِى الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ وَنَظْمِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

খেলাফতের উদ্দেশ্য হল, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। ইবাদত, লেনদেন এবং সামাজিকতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সীমারেখার প্রতি লক্ষ রাখা। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২। শাস্তির ব্যবস্থা

খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, শাস্তির ব্যবস্থা করা। চাই চুরির শাস্তি হোক বা মদপানের বা যেনার বা হত্যার বা অপবাদ দেয়ার।

মোট কথা, শরীয়ত যে অপরাধের জন্য যে ধরনের শাস্তি নির্ধারন করে দিয়েছে, অপরাধীকে সে ধরনের শাস্তি প্রদান করা। আর যদি কোন অপরাধীর জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন শাস্তি নির্ধারিত না থাকে, তবে তাকেও শাস্তি দেয়া বা হুঁশিয়ার করে দেয়া। যদি ইসলামী দন্ড, রক্তপন-শাস্তি ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিরোধিতা করা হবে এবং বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট হবে। বিশ্বকে এবং তাঁর শান্তিকে ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন হলো, অপরাধীদের উপর নির্ধারিত শাস্তিসমূহ প্রয়োগ করা। লেখক বলেন,

وَإِقَامَةُ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ -

খেলাফতের উদ্দেশ্য হল, মন্দ কাজকে দূর করার জন্য ইসলামী দন্ড-রক্তপন এবং বিভিন্ন শাস্তিকে বাস্তবায়ন করা।

৩। জনগণের সহজতার দিকে লক্ষ্য রাখা

কিন্তু উপরোক্ত কথার অর্থ এই নয় যে, লোকদের উপর অন্যায় ভাবে কঠোরতা করবে। এটি কখনো হতে পারে না. বরং ইসলামী দন্ড প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কারো সমালোচনার কোন পরোয়া করবে না। আর যেখানে শাস্তির প্রয়োজন হয় না সেখানে মানুষের সাথে সদাচরণ এবং নরম ব্যবহার করবে। আর যদি তার মধ্যে কোন ধরণের সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তার সন্দেহকে সহজে দূর করে দিবে। এভাবে সদাচরণ বেশী প্রকাশ পায়। সুতরাং সৎ চরিত্রাবলী থেকে বিমুখ থাকবে না। অন্যথায় তাবলীগ বা ধর্ম প্রচার এবং

সৎকাজের প্রসার করার ক্ষেত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন,

وَالرِّفْقُ وَالتَّطْيِيْبُ لِتَرْوِيْجِ الْمَعْرُوْفَاتِ

খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহ থেকে এটিও একটি যে, সৎকাজের প্রসারের জন্য লোকদের সাথে নরম ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দেবে।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন নম্রতাও দেখাবে না যে উহাকে মিষ্টি মনে করে খাওয়ার চেষ্টা করবে। আবার এমন কঠোরতাও করবে না যে, মানুষ তেঁতো ঔষধ মনে করে তা থেকে পালিয়ে যাবে। নম্রতা এবং কঠোরতা উভয়টি পরিপূর্ণ ভাবে একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। আর এর জ্বলন্ত নমুনা হল খোলাফায়ে রাশেদীন। বিশেষ ভাবে হযরত আবুবকর (রঃ) এবং উমর (রঃ)।

৪। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা

খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। কারণ ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ। দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর জ্ঞান রাখা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শেখার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে কোন মুসলমান ধর্মের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকে। ইমামের দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে শিক্ষা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা। যদি তাদেরকে সতর্ক করতে হয় তাতে বিলম্ব না করা। তিনি বলেন,

وَالتَّعْمِيْمُ لِلتَّعْلِيْمِ وَالْإِكْرَاهُ فِىْ ضَرُوْرِيَاتِ الدِّيْنِ -

খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহ থেকে আরেকটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং ধর্মের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলোর জন্য লোকজনকে বাধ্য করা।

এরপর ইমামের দায়িত্ব হল, তাবলীগের পরিধি বাড়ানো। তবে এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্বরীকা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ প্রথমে নিজের সংশোধনের চিন্তা করবে, এটি হলো তাবলীগের প্রথম স্তর। পরে নিজের পরিবারের মধ্যে তাবলীগ শুরু করবে, এটি তাবলীগের দ্বিতীয় স্তর। এর পর নিজের গোত্রের লোকদের উপর তাবলীগ করবে, এটি তাবলীগের তৃতীয় স্তর। এর পর নিজের শহর বাসীর মধ্যে তাবলীগ করবে, এটি তাবলীগের চতুর্থ স্তর। এর পর শহরের আশপাশের লোকদের উপর তাবলীগ করবে এটি তাবলীগের পঞ্চম স্তর। এর পর পুরো বিশ্বে তাবলীগ করবে এটি তাবলীগের শেষ স্তর। এ নিয়মটি তাবলীগের স্বাভাবিক চাহিদা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাবলীগের ক্ষেত্রে এ নিয়মটিই অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বলেন,

وَالتَّوْسِيْعُ فِى التَّبْلِيْغِ عَلٰى التَّدْرِيْجِ حَسْبَ دَرَجَاتِهِ

তাবলীগের স্তর হিসেবে ধীরে ধীরে উহাকে বিস্তৃত করবে।

সবাইকে কোরআন মুখী করা

এ ছাড়া খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহের ইহাও একটি যে, ইমাম এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার রুজ্জকে শক্ত করে ধরবে, যখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে মজবুত করে ধরবে, তখন তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বিশৃংখলা আপনা আপনিই খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে শক্ত করে ধর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করোনা। অর্থাৎ সবাই মিলে কোরআনকে শক্ত করে ধর। এ রজ্জুটি ছিঁড়তে পারে না ছাড়া যেতে পারে। যদি সবাই মিলে শক্ত ভাবে উহাকে ধরে রাখ তবে কোন ফেৎনাবাজ ফেৎনা করে সফল হতে পারবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মত, মুসলমানদের সামাজিক শক্তিও দৃঢ় হবে।

মোট কথা, মুসলিম জাতিকে এক মঞ্চে আনার জন্য কোরআনকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বর্তমানে নতুন নতুন অনেক দলের আবিষ্কার ঘটছে, কিন্তু বাস্তবে এগুলোর উল্লেখযোগ্য কোন লাভ দেখা যায় না। তিনি বলেন,

وَالتَّنْظِيْمُ بِالْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللّٰهِ لِدَفْعِ الْفِرْقَةِ وَتَوْحِيْدِ الْأُمَّةِ ـ

খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, দ্বন্দ্ব দূর করে উম্মতকে এক করার জন্য আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে শক্ত করে ধরার ব্যবস্থা করবে।

আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা

শরীয়ত এবং তরীকত উভয়টি একই জিনিস। শরীয়ত এবং তরীকত ভিন্ন কোন জিনিস নয়। যেমন নাকি কোন কোন মূর্খ লোক এরকম ধারনা করে। শরীয়ত এটি ভেতর বাইরের শুদ্ধির নাম। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ভিতরের শুদ্ধিকে ত্বরীকত বলা হয়, তাকে আবার তাসাউফ বা ইহসানও বলা হয়। যেতেতু নবীগণের প্রেরনের উদ্দেশ্য হল, উভয়টির পূর্ণাঙ্গ দান করা অর্থাৎ বহির্ভাগ এবং অন্তর ভাগ উভয়টির পরিপূর্ণতা দান করা। আর খেলাফতের উদ্দেশ্য হলো নবী গণ সরল পথে জমে বসা এবং লোকদেরকে সে পথে পরিচালিত করা। সুতরাং আত্মশুদ্ধিও খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি।

এ দিকেই ইঙ্গিত বহন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি প্রশংসিত চরিত্রগুলোর পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। অন্যত্র বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার চরিত্রে চরিত্রবান হও। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব গোনাহ ছেড়ে দাও। এটিই আত্মশুদ্ধি, ইহাই আল্লাহ তায়ালার চরিত্র। সুতরাং একথা বলা ঠিক হবে যে, ইমামের দায়িত্ব হলো মানুষকে আল্লাহ তায়ালার চরিত্র শিক্ষা দেয়া। তিনি বলেন,

وَتَرْبِيَةُ خَلْقِ اللّٰهِ عَلٰى أَخْلَاقِ اللّٰهِ

খেলাফতের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি হল, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালার চরিত্র শিক্ষা দেয়া।

পূর্বে বলা হয়েছে ইমামের দায়িত্ব হলো লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার আখলাক শিক্ষা দেয়া। সাধারণত একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তায়ালার আখলাক মানে কি? এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার আখলাক পাঁচটি জিনিসের সমষ্টিকে বলেছেন, জিনিসগুলো হল ঃ (১) জামায়াত তথা একতাবদ্ধতাকে আবশ্যক মনে করা, (২) ইমামের কথা শোনা। (৩) ইমামের আনুগত্য করা, (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা, (৫) শর্ত সাপেক্ষে নিয়ম মাফিক জেহাদ করা। এই পাঁচটি জিনিস আল্লাহ তায়ালার চরিত্র এবং এই পাঁচটি জিনিস ধর্মীয় রাজনীতির মূলভিত্তি। তিনি বলেন,

وَلَخَّصَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسٍ وَهِيَ مَبَانِي أُصُولِ السِّيَاسِيَّةِ الدِّيْنِيَّةِ، اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার চরিত্র পাঁচটি জিনিসকে বলেছেন। আবার এই পাঁচটি জিনিস ধর্মীয় রাজনীতির ভিত্তি। যথা– (১) জামায়াত (২) কথা শোনা (মানা) (৩) আনুগত্য (৪) হিজরত (৫) জেহাদ।

॥সমাপ্ত॥